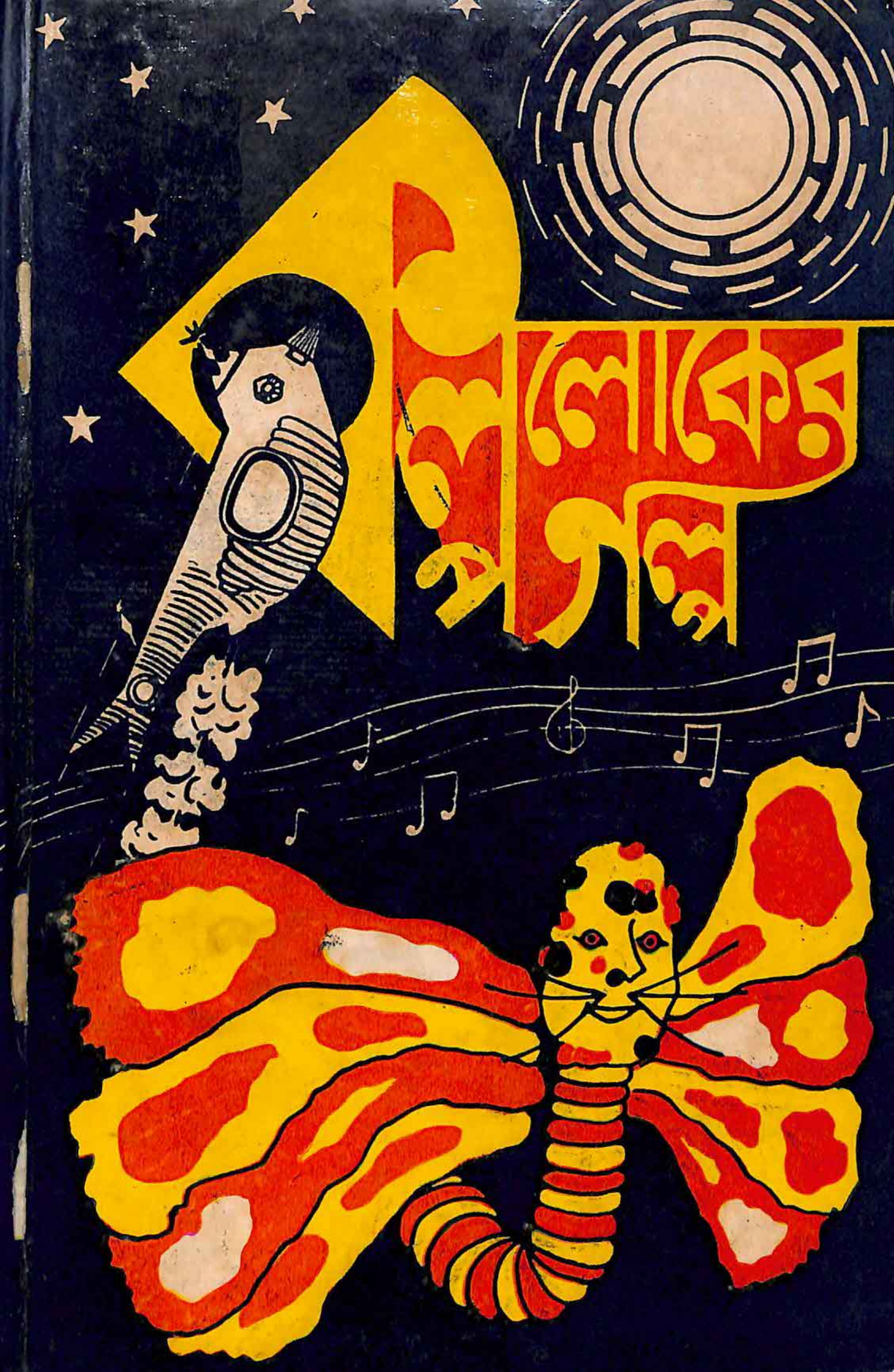


লোকের
গল্প

কল্পলোকের গল্প

শ্রীপতি ঘোষ

পরিবেশক

বুক হোম

প্রকাশক ॥ বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২ সি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ ১৩৮৮
দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯২

মূল্য — ছয় টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ও ছবি ॥ অলোক চৌধুরী

মুদ্রক ॥ শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলকাতা-৭০০০০৭

এক

এমন যে কাণ্ড হবে বুঝতে পারি নি প্রথমে।

বিবর্ত সেন আমার বন্ধু। সেদিন হঠাৎই এল আমার বাড়িতে। সবে চেয়ারে বসে নিউটনের অভিকর্ষতত্ত্ব ছাড়িয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বে মন দিয়েছি। এমন সময় একরাশ ঝড় নিয়ে সে আমার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই সোজা বলে বসল ঃ চল্, আজ বিকেলটা কাটিয়ে আসি পেঙ্গুইনদের শহর থেকে।

নাম শুনেই ত চোখ আমার কপালে উঠে গেল। পেঙ্গুইনদের শহর! সে আবার কি!

পাশের চেয়ারে আয়েস করে বসে বিবর্ত সেন বলল ঃ কেন, ভূগোলে পড়িস নি, পৃথিবীর দক্ষিণমেরু অঞ্চলের সর্বশেষ অঞ্চল আণ্টার্কটিক সাগরের মাঝে পেঙ্গুইন দ্বীপে পেঙ্গুইন পাখিদের বাস।

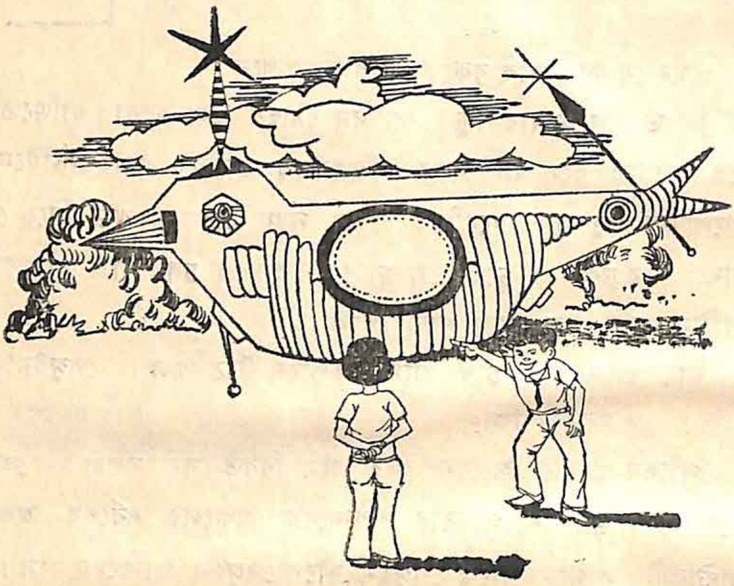
ঃ ঠিক ঠিক। আমি হেসে বললাম ঃ আজ হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন তোর?

ঃ আরে ধ্যেৎ, তোদের কলকাতা শহরটা একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে আমায়। তাই আজ ভাবলাম তোকে নিয়ে ঘুরে আসি ওখানে। আর তুই ছাড়া আমার এসব যাদুটাদুর মানে আর কে বোঝে বল্!

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম ঃ কেন, আবার বুঝি নতুন ধরনের কোন কল বানিয়েছ? সেটার বিদ্যেই আজ বুঝি আমায় দেখাতে চাও?

বিবর্ত সেন নিরাসক্তভাবে জবাব দিল ঃ আমার বিদ্যে ত তোমার জানাই আছে। তোমরা চাঁদ-মঙ্গলে যাবার জন্যে যে টন টন ওজনের অদ্ভুত আকারের তিনপর্যায়ী রকেট বানিয়েছ, আমার যাদু রকেট ত আর সে ধরনের নয়। আমার এ রকেট একেবারেই হালকা। ওজন

বোধ হয় কয়েক কুইন্টাল হবে মাত্র। আর আকার ত তোমায় সেদিন দেখিয়েই ছিলাম। পাখির মত। তবে ডানা নেই তার।



আমার এ রকেট একেবারেই হালকা

আমি বলি কি, আমার এ কাজকে হয়তো যাদু-ভোজবাজি বলে আজকে উপেক্ষা করছে দেশের লোক, কিন্তু সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন—

হঠাৎ কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ত সেন অধৈর্য হয়ে বলল ঃ আচ্ছা, তাহলে যাদু রকেটটাকে ডেকে পাঠাই। যাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও। হাতে সময় নেই।

মুখের কথা মুখে থাকতেই ভীষণ শব্দ করে আমার উঠোনে বিবর্ত সেনের চমৎকার পাখি রকেটটা এসে হাজির হল।

অগত্যা তৈরি হয়ে যাদুকর বন্ধুর সঙ্গে রকেটে গিয়ে উঠতে হল। বিবর্ত সেন আমাকে সাবধানে বসতে বলে নিজে গিয়ে ঠিক যাদু রকেটের মুখের কাছে বসল। মুখে শুধু বলল ঃ ভারত মহাসাগর হয়ে আণ্টার্কটিক সাগরের পেঙ্গুইন দ্বীপ।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিবর্ত সেনের উদ্ভাবনী শক্তিতে। আমাদের বিজ্ঞানীদের রকেট ওড়ার সময় কানফাটানো শব্দ করে, কত জোরে ধোঁয়া ছেড়ে সোঁ সোঁ করে উপরে ওঠে। কিন্তু বিবর্ত সেনের যাদু রকেট বা পাখি রকেট সে রকম কোন বিকট শব্দ না করে কিংবা ধোঁয়া না ছেড়ে কেমন শান্ত ধীরগতিতে সোজা উপরে উঠে গিয়ে পাখির মত ভেসে চলল আকাশপথে। মনেই হল না যে, আমি উপরে আছি, না পৃথিবীর বুকে আছি। অথচ তোমরা তো জান পৃথিবীর পাঁচ মাইলের উপরে বাতাস খুব হালকা এবং তারও উপরে মানুষের পক্ষে নিশ্বাস নেয়া খুব কষ্টকর। কিন্তু আমার সেরকম কোন কষ্টই হচ্ছে না। কারণ রকেটে চড়বার সময় বিবর্ত আমাকে একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল আর বলেছিল ঃ মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানোর ওষুধ। আগেকার মুনিঋষিরা এই ওষুধের ব্যবহার জানত। আজকালতো তোমরা মহাকাশ অভিযানে টনটন অক্সিজেনের বোতল পিঠে বেঁধে তবে ওপরে ওঠ। কোন কারণে অক্সিজেন ফুরিয়ে গেল ত ব্যস। কিন্তু এ ওষুধে তুমি যতক্ষণ খুশি শূন্যে ঘুরে বেড়াতে পার। তাছাড়া এই ওষুধের ফলে মহাশূন্যের বিষাক্ত ভাইরাস তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আমি বিবর্ত সেনের এই সব কথা নিয়ে যখন তন্ময় ছিলাম, ঠিক তখনই সে আমাকে ডেকে বলল ঃ দেখ দেখ সঞ্জয়, নিচের দিকে চেয়ে দেখ। বল ত এখন আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি ?

নিচে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম ঃ বাঃ, বেশ সুন্দর সারি সারি রবারের ক্ষেত ত। লোকগুলোকে মনে হচ্ছে যেন পিঁপড়ের মত।

বিবর্ত সেন বলল ঃ ঠিক ধরেছ। আমরা এখন দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে যাচ্ছি। এটা মালয়ের কোন রবারের ক্ষেত। তারপর বিবর্ত সেন হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে বলল ঃ দেখ সঞ্জয়, আমরা চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে কত পুরনো হয়ে গেছি। অথচ

ভাব ত একবার রামায়ণ-মহাভারতের যুগের কথা কিংবা গুপ্তযুগের কথা। আমাদের চিন্তার বাইরে কোন কাজ হলেই আমরা সেটাকে বিজ্ঞানের খোলা দৃষ্টি দিয়ে বিচার না করে হয় হেসেই উড়িয়ে দিই, কিংবা অদ্ভুত ভোজবাজি বলে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিই। কিন্তু দেখ, এই যে রবার থেকে আজকাল কত নানা ধরনের জিনিস হচ্ছে। আমিও বানিয়েছিলাম এক রকম জিনিস। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, সেবার যখন কামাচ্‌কাটকা দ্বীপে বিশ্ব যাত্নকর সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে আমি আমার রবারের দাঁত বানিয়ে উপস্থিত সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম। এবিদ্যেটা আমি জাভার মিঃ জুগুার নামে এক জাত্নকরের কাছ থেকে শিখেছিলাম। জানই ত আমাদের পৃথিবীতে বাঘ, সিংহ, কুমীর, সাপ প্রভৃতি কত না হিংস্র জন্তু আছে। তাদের ওই সব বিষাক্ত দাঁতগুলোকে যদি রবারের দাঁতে পরিণত করে দিতে পারা যায়, তবে কি সেদিন তাদের কামড় থেকে মানুষের আর কোন ভয় থাকবে ?

আমি আমার অজান্তেই বলে উঠলাম ঃ ঠিক, ঠিকই ত !

হঠাৎ মনে পড়ে গেল একদিনকার কথা।

বিবর্ত সেনের বাড়িতে একদিন শীতের তুপুরে বেড়াতে গেছি। গেটের কাছে যেই মাত্র না গিয়ে বিবর্ত সেনের নাম ধরে ডেকেছি, আর যাই কোথায় ? বিকট চিৎকার করে তেড়ে এসে বিবর্ত সেনের গ্রেহাউণ্ড শিকারী কুকুরটা দিল চট করে পায়ের উপর কামড় বসিয়ে। আমি ত ভয়ে তখন একেবারে কুক্‌ড়ে গেছি। বল ত কুকুরের কামড়কে কেনা ভয় পায় ?

ততক্ষণে বিবর্ত সেন এসে হাজির। মৃত্ন হেসে বলল ঃ ভয় নেই সঞ্জয়, ওর বিষ দাঁত আমি ভেঙে দিয়েছি। দেখ, তোমাকে যেখানে কামড়েছে, সেখানে এতটুকু দাগও পড়ে নি ; কিংবা তোমার কোন ব্যথাও লাগে নি।

তাই ত! ভয়ের চোটে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ব্যথা পেয়েছি কি না পেয়েছি। আত্মস্থ হয়ে দেখলাম কুকুরটা যেখানে কামড়েছে, সেখানে কোন দাগ, রক্ত কিংবা ব্যথা পর্যন্ত পাই নি।

ব্যাপার কি?

উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম: এটা কি তোমার কোন নবতম আবিষ্কার মিঃ যাদুকর?

হেসে বিবর্ত সেন হালকা মেজাজে বলল: এ আর এমন কি। সত্যিকারের যাদুকররা ত নিয়তই আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল থাকে।

আজ বুঝতে পারলাম, সেদিন তার গ্রেহাউণ্ডের মুখে আসল দাঁতের পরিবর্তে রবারের দাঁত লাগানো ছিল এবং তা কেন লাগানো ছিল, তাও বুঝতে পারলাম।

: এ কি, সামনের আকাশটা অত লাল কেন বিবর্ত? সবিস্ময়ে আমি জানতে চাইলাম।

বিবর্ত সেন অন্যদিকে কি একটা লক্ষ্য করছিল। সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলল: ওটা আগ্নেয়গিরির লাভার আগুনের আঁচ।

: আগ্নেয়গিরি! চমকে উঠলাম আমি।

মনে পড়ে গেল, পম্পেঈ নগরীর শেষ দিনের কথা। সে কী অসহায়, করুণ আর্তনাদ! সব যেন এখনো স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি ভিসুভিয়সের ধ্বংসলীলার ভয়াবহ আর্তনাদের শব্দ।

বিবর্ত সেন তখনো বলছে: আমরা এখন জাভা দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। ভূগোলে পড়েছ ত, এখানে অনেক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। মাঝেমাঝে আগ্নেয়গিরির খেয়ালের কথা ত কাগজেই পড়ে থাক। আজ নিজের চোখে দেখে নাও, আগ্নেয়গিরি সব সময় কেমন আকাশকে লাল দৃষ্টি নিয়ে চোখ রাঙাচ্ছে। ও যেন

বলতে চাচ্ছে রবিঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলির মত ভাষায়ঃ খবরদার। তফাৎ যাও—তফাৎ যাও। আমাকে ঘাটিও না।



ওটা আগ্নেয়গিরির লাভার আগুনের আঁচ

আমাদের পাখি রকেটটা এবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে আবার সোজা দক্ষিণ-পুবমুখো উড়ে চলল।

বিবর্ত সেন বলল: ওই চেয়ে দেখ, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবেলায় আরব্যোপন্যাসে পড়েছি এই দ্বীপের কথা। তখন কত কিই না ভাবতাম এই দ্বীপটা সম্পর্কে। মনে পড়ে সঞ্জয়, বসোরার সেই হাসানের গল্পটা!

আমাদের পাখি রকেট এবার দক্ষিণমুখো হয়ে অস্ট্রেলিয়ার দিকে চলতে লাগল। এই পথেই ডাক নিয়ে পৃথিবীর বিমান যাতায়াত করে। আমি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটি জেট বিমান যাচ্ছে ডাক নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। বিমানটার গতি দেখে

মনে হল, যেন একটা গরুর গাড়ি পাল্লা দিচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের মোটরের সঙ্গে।

নিরাসক্তভাবে বিবর্ত সেন বলল : আগে তোমাদের কত গৌরব ছিল এই জেট বিমানকে নিয়ে।

মুখের কথা কেড়ে আমি ওর কথার সঙ্গে যোগ করলাম : আর এখন গর্ব করি চাঁদে যাবার রকেট নিয়ে, তাই ত? সমর্থনের আশায় চাইলাম ওর মুখের দিকে।

বিবর্ত সেন ভয়ংকর নিস্পৃহ কণ্ঠে ব্যঙ্গোক্তি করল : তা যা বলেছ। তোমাদের এতেই এই। আরো কিছু থাকলে না জানি কি করতে। তোমাদের এই সব ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান?

: কি মনে হয়?

: মনে হয় তোমরা বড়ই রক্ষণশীল তোমাদের চিন্তার ব্যাপারে।

: এ তুমি কী কথা বলছ বিবর্ত? মৃদু প্রতিবাদ করলাম আমি।

: ঠিকই বলছি সঞ্জয়। বিজ্ঞানকে তোমরা মান। তার অবদানকেও তোমাদের উন্নতির কাজে লাগাও, যেমন লাগাও তোমাদের ধ্বংসেরও কাজে। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাহীন জগতের সন্ধানে তোমরা কি কখনো ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছ তোমাদের মনীষাকে, তোমাদের জ্ঞানকে, তোমাদের পাণ্ডিত্যকে?

: তাহলে কেমন করে আমরা পেলাম আর্যভট্ট-নিউটন-এর জগৎ পেরিয়ে সত্যেন বোস-আইনস্টাইনকে?

: পেয়েছ, কিন্তু খুব দেরিতে।

: কেমন করে?

: তোমাদের এই দেরির কারণ—তোমরা তোমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার গণ্ডী ভেঙে উদার চিন্তা-ভাবনার জগতে পৌঁছতে পার নি বলেই।

: তোমার এ যুক্তি ঠিক নয় বিবর্ত।

ঃ তোমাদের ইতিহাসই ত তাই বলে সঞ্জয়। বলতে পার, সক্রেটিস কেন বিষপানে আত্মহত্যা করেছিলেন? গ্যালিলিওকে কেন পোপেদের সমাজে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল? ডারউইনের তত্ত্বকে কেন প্রথমদিকে চরম উপেক্ষার চোখে দেখা হয়েছিল? আর তারই জন্যে কেন মহামান্য পোপেরা অলড্যুস হাক্সলিকে জনসমাজে প্রবল বিদ্রূপ ও কটাক্ষবাণে জর্জরিত করে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল? রেডিও আবিষ্কারক হিসেবে প্রথম আবিষ্কর্তা জগদীশ বোস হওয়া সত্বেও মার্কনি কেন সেই সম্মানে ভূষিত হল? কেন তাহলে দুজনকেই আলাদা আলাদা ভাবে মর্যাদা দেয়া হল না। কেন, কেন এই অসাম্য? কেন এই পক্ষপাতিত্ব?

আমার উত্তর দেবার কিছুই নেই। কি উত্তরই বা দেব বিবর্ত সেনের এই মৌলিক প্রশ্নের।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল দুজনে চুপচাপ করে।

হঠাৎ দেখি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল আমাদের পাখি রকেটটা। বিবর্ত সেন বলল ঃ এসে গেছি আমরা পেঙ্গুইনদের দেশে।

শীতের পোশাকটা ভাল করে সেঁটে নিয়ে দুজনে নেমে এলাম পাখি রকেটটা থেকে।

নেমে আসতেই সামনে আমরা যা দেখলাম তাতে আমি অবাকই হয়ে গেলাম। দেখি কি—কতকগুলো পেঙ্গুইন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

বিবর্ত সেন রহস্য করে বলল ঃ আজকাল মানুষ ত মানুষকে অভ্যর্থনা করতে ভুলে গেছে; তাই ওরাই এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে।

সত্যি, বড় শান্ত প্রাণী এই পেঙ্গুইনেরা। এমন ভাবে শান্ত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাতে মনে হয় সুন্দর পোশাক পরে নতুন অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করতে এসেছে ওরা। সত্যি, বড় সুন্দর লাগল ওদের এই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকাটা। যেন শীতের

আঁটোসাঁটো পোশাক পরে কতকগুলো বুড়ো বেরিয়েছে সান্ধ্য ভ্রমণে।

বিবর্ত সেন চলতে চলতে বলল : সত্যি এটা পেঙ্গুইনদের স্বর্গ-রাজ্য। এখানে আর কোন প্রাণী দেখতে পাবে না তুমি। এমন কি মানুষও না।

: কেন ? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

: এই গোটা দ্বীপটাই যে বরফে ঢাকা। এটাকে বরফের সমুদ্র বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে বরফের ভয়ংকর ঝড় ওঠে। সে ঝড় দেখবার মত।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বিবর্তর মুখের দিকে। সে বোধহয় বুঝতে পারল আমার মনের কথা। তাই সে বলল : তুমি বোধ হয় জান না ; আমি কয়েক বছর কাটিয়েছিলাম এখানে পেঙ্গুইনদের দেশে পেঙ্গুইন হয়ে। সে ভাই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা !

কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়েছিলাম বরফের একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর। তার নিচে দেখলাম একটা জলের খাড়ি। পাহাড়ের উপর একদল পেঙ্গুইন লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ জলের দিকে চেয়ে। ওদের যে দলপতি বড় পেঙ্গুইনটা মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে, আর অমনি অন্য পেঙ্গুইনরা টুপ করে মুখে একটা করে মাছ তুলে আনছে। ভারি বিচিত্র ওদের মৎস্য শিকার। মনে পড়ে গেল, ১৯২৮ সালে আমেরিকার রিচার্ড বায়ার্ড এখানে তার পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন এবং এই পেঙ্গুইনদের নিয়ে সুন্দর একটা ছবিও তুলেছিলেন। পারলে দেখে নিও ছবিখানা। বড় আনন্দ পাবে।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখছিলাম আর বিবর্ত সেনের বিচিত্র যাদুর গল্পটা শুনছিলাম।

বিবর্ত সেন বলেছিল : সেবার হয়েছে কি আমেরিকায় এসেছি আমার যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখাতে। খেলাশেষে একদিন

আমার এই যাদু আংটিটা রেখে বাইরে এসেছিলাম কি একটা কাজে। হঠাৎ দেখি আমার শরীর কাঁপছে আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরা একটা লোক দাঁত বার করে হাসছে। হ্যাঁ, দেখেই ওকে চিনেছি। যাদুর নামে নোংরা সব ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিতে চায়। আর সব থেকে বড় কথা লোকটা বড় হিংসুটে।

আমি ধরে ফেলেছি লোকটার ফন্দি কি! তাই মরীয়া হয়ে ঘরের দিকে ছুটলাম আমার যাদু আংটিটা নেবার জন্যে। কি দুর্ভাগ্য! পা আর চলল না। মুহূর্তে আমি পেঙ্গুইনে পরিণত হলাম। ও আমাকে পেঙ্গুইন বানিয়ে এখানে এই দ্বীপে চালান করে দিল।

কি আর করা! এখানে থাকি আর পেঙ্গুইনদের সঙ্গে বাস করি। কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা আমায় আপন করে নিল। পশুপাখির মধ্যে যে এত মায়া-মমতা আছে, তা আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। ওদের দলপতি খুব যত্নে রাখত আমায়। আমার যাতে কোন কষ্ট না হয়, সেদিকে কড়া দৃষ্টি ওর। আমার এই অবস্থার কথা শুনে ওরাও খুব দুঃখ পেয়েছিল।

এমনি ভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। তারপর বহু কষ্টে বহু আয়াসে ধ্যান করে লাভ করলাম ফের মনুষ্য জন্ম।

তারপর দেশে ফিরে এসে যাদু আংটির সাহায্যে সেই বদমায়েস বাজীকরকে টেনে আনলাম আমার বাড়িতে। আরম্ভ হল সে এক বিচিত্র বাঁদর নাচ। এ যাত্রায় রেহাই দেয়ার জন্যে সে কী ওর আকুলি-বিকুলি। শেষ পর্যন্ত প্রাণে বড় মায়া এল। তাছাড়া তুমি ত জান, আমি আমার বিদ্যেকে মানুষের ক্ষতির কাজে কখনো লাগাইনে। তাই যারা এর নামে নানা রকম স্বার্থসিদ্ধি করবার চেষ্টা করে তাদের আমি ঘৃণা করি। যা হোক শেষমেশ ওকে একটা আরশোলা বানিয়ে প্রাণে না মেরে একটা বোতলে পুরে রেখে দিয়েছি আমার ঘরের আলমারিতে।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম বিবর্ত সেনের বিচিত্র জন্মান্তরের কথা। ঘোর তখনো কাটে নি। হঠাৎ দেখি এক অদ্ভুত কাণ্ড!

বিবর্ত সেন কি সব বলছে একপাল পেঙ্গুইনদের সামনে দাঁড়িয়ে।



কতকগুলো পেঙ্গুইন সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে

এ কি! আমরা একটু আগে ছিলাম সেই জলের ধারে পাহাড়ের উপর। এখন দেখছি দাঁড়িয়ে আছি পেঙ্গুইনদের বাসগৃহের সামনে।

বিবর্ত সেন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল: পুরনো বন্ধুত্বটা একটু যাচাই করে নিলাম আর কি। দেখলাম, ওরা ভোলে নি আমার কথা। জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা। বললাম, আমার একজন গুণগ্রাহী বন্ধু। ওরা বড় আনন্দ পেয়েছে আমরা ওদের দেশে বেড়াতে এসেছি বলে। তবে বড় দুঃখ পেলাম, ওদের সেই দলপতিটা মারা গেছে কিছু দিন আগে। এখন এই যে নতুন দলপতি দেখছ, ওকে সে মারা যাবার সময় বলে গেছে, হয়ত আমি আসতে পারি। যদি আসি, তবে যেন সাদরে অভ্যর্থনা করা হয় আমাকে।

এতক্ষণে সেই প্রথম দৃশ্যের অর্থটা আমার বোধগম্য হল। বিবর্ত সেনের নতুন এই বিদ্যেটার কথা আমার জানা ছিল না। আজ

জানলাম, সে পাখিদের সঙ্গেও কত সহজভাবে কথা বলার ভাষাটা আয়ত্ব করে ফেলেছে।

এবার আমাদের ফেরার পালা। বিবর্ত সেন বলল : ওরা বলছে, ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে আমাদের ছেড়ে দিতে।

চেয়ে দেখলাম, কেমন ম্লান মুখে ওরা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ওরা পাখা নেড়ে আমাদের বিদায় জানাল যখন আমরা পাখি রকেটে উঠে সবে যাত্রা করেছি।

আমরাও হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালাম।

মুহূর্তে আমাদের পাখি রকেটটা অনেক উঁচু আকাশের বুক চিরে চলতে লাগল ঘরমুখো।

পৃথিবী সবে সন্ধ্যার মুখ দেখছে। সন্ধ্যা নামার আর বেশি দেরি নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের বাড়িতে। ঘণ্টা তিনেকের বৈকালিক ভ্রমণ বেশ ভালই হল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিবর্ত সেন বলল : ওরা আজ আমায় একটা বিচিত্র অনুরোধ করেছে, সঞ্জয়।

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম : কী সে অনুরোধ ?

: তুমি বোধ হয় জান, পৃথিবীর ভয়ংকর আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে চতুর্থ আগ্নেয়গিরি মাউণ্ট এরবুস (আরবাস ?) রয়েছে ওই পেঙ্গুইন দ্বীপে। মাঝে মাঝে তার ভয়ংকর বীভৎস খেয়ালে বহু পেঙ্গুইনের সর্বনাশ হয়। তাই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম : তাই বুঝি ওরা অনুরোধ করেছে ঐ আগ্নেয়গিরিটাকে স্তব্ধ করে দিতে।

: ঠিক তাই। স্মিত হেসে বিবর্ত সেন বলল : তাই ভাবছি—

: ভাবনার আর কি আছে ? তোমার আংটিটা দিয়ে করে ফেল কাজটা।

বিচিত্র হাসিতে দুলে উঠল বিবর্ত সেন : এতক্ষণে তুমি ঠিকই বলেছ সঞ্জয়। কিন্তু পাগল, ভুলে যাচ্ছ কেন, সাধারণ মানুষের

কাছে বিজ্ঞানের কাণ্ডকারখানাটাই ত যাদু বলে মনে হয়। তাই বিজ্ঞানীরা তাদের কাছে যাদুকর। কিন্তু তুমি ত জান, আমার সব যাদুর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের কোন না কোন মঙ্গল সূত্র। তাই ভাবছি, আজ পর্যন্ত ত কোন বিজ্ঞানী পারেন নি পৃথিবীর সভ্যতাকে বাঁচাতে আগ্নেয়গিরির ভয়ংকর সর্বনাশের হাত থেকে। পম্পেঈ নগরীর কথা ভেবে দেখ ত। কেমন করে সর্বনাশ হয়ে গেল একটা গোটা সভ্যতার। কিন্তু সঞ্জয়—আবেগে আমার হাতটা চেপে ধরল বিবর্ত সেন : যদি এই সর্বনাশকে রুখতে পারা যায়, তবে ভেবে দেখ ত সেদিন পৃথিবীর কত উপকার হবে।

: বিজ্ঞানের আজ কত উন্নতি! সম্ভব নয় কি এই সর্বনাশকে রোখা? আমি জিজ্ঞাসু হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

: আলবাৎ! বিবর্ত সেন আকাশ কাঁপিয়ে জবাব দিল : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব আমি এই সর্বনাশকে রুখতে। ওদের আমি কথা দিয়েছি সঞ্জয়। এ কাজ আমাকে করতেই হবে। কথার আবেগে বিবর্ত সেনের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল যেন।

দেখলাম, সে যেন কী এক স্বপ্ন দেখছে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে! আর অঙ্কের জটিল কি সব হিসেব কষছে। আমি কি তার কিছু বুঝি। আমার কাছে তা চির অবোধ্যই রয়ে গেল। শুধু বুঝলাম, এত যার সদিচ্ছা এবং অধ্যবসায় সে ত পারবেই।

দুই

ভয়ংকর একটা সমস্যায় পড়ে সেদিন বিবর্ত সেনের বাড়িতে এসে হাজির হলাম। গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি আমার সামনে একগাল হাসি নিয়ে বিবর্ত স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্যে। আমায় দেখে বলে উঠল ঃ এস এস, সঞ্জয়। আমি জানতাম তুমি আসবে।

বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম ঃ কি করে জানলে আমি আসব ?

ঃ তোমরা ত কিছুই বিশ্বাস কর না—বিশেষ করে তোমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। বসতে গিয়ে দেখি বিবর্তর টেবিলে খোলা রয়েছে বিরাট একখানা বই—কালো মরক্কো-চামড়ায় বাঁধান। বসতে বসতে বিবর্ত বলল বইখানা দেখিয়ে ঃ এই ত, তোমার সামনেই প্রমাণ রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের যাদুবিশারদ বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালের যাদুতত্ত্ব।

মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম —দ্য জাজমেণ্ট সীট অব্ বিক্রমাদিত্য। তোমরাও হয়ত পড়ে থাকবে লেখাটা। বিচারের আসনটার কত অলৌকিক কাহিনী কালেকালে জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

বিবর্ত তখনো বলে চলেছে ঃ জান সঞ্জয়, বইটা পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম, সেকালের মানুষ জ্ঞানে বিদ্যায় বিজ্ঞানে কত উন্নতই না ছিল। মাঝে মাঝে তাই ভাবি, সেইসব কালচারগুলোকে যদি আজ ভালভাবে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা যেত, তবে

বোধ হয় আজ আমরা আরো দ্রুত উন্নতির পথে যেতে পারতাম। যাক, তোমাকে আজ আমার একটা নতুন সৃষ্টি দেখাব।

মুখের কথা মুখে থাকতেই বিবর্ত ডাকল ঃ সস্থাভবে।

নাম শুনেই আমার মূর্ছা যাবার অবস্থা। এ আবার কি বিচিত্র নাম! বিবর্ত সেনের সব কাজগুলোই যেন কেমন বিচিত্র ধরনের।

ডাকতে না ডাকতেই সেই অদ্ভুত জীবটি সাপের মত হেলতে তুলতে এসে সামনে দাঁড়াল। নাম শুনে ত মূর্ছা যেতে বসেছিলাম। এবার হাসব না কাঁদব কিছুই ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

জীবটি সাপের মত সরু লম্বা। গায়ে বিচিত্র নকশাকাটা রঙিন কোট। মাথাটা আছে কি নেই কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত চেহারা।

বিবর্ত সেন বলল ঃ নাম আর চেহারা দেখে ঘাবড়ে যেও না সঞ্জয়। খুব বাধ্য জীবটি আমার। মুখের কথা মুখে থাকতেই এ আমার সব কাজ করে দেয় এবং এর সাহায্যে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সব আমি টের পাই। কে কার সর্বনাশ করছে, কে কি ভাবছে না ভাবছে—সবই আমি জানতে পারি এর দ্বারা। দুরূহ চেষ্টা আর সাধনার ফলেই একে আমি পেয়েছি এবং এ ব্যাপারে প্রকৃত হদিশ আমায় দিয়েছে ওই বইখানা।

এতক্ষণে বুঝলাম, আমি কেন এসেছি ও আগেই কি করে টের পেল।

বিবর্ত সেন তখনো বলছিল ঃ ওর নামটা বড় অদ্ভুত, তাই না সঞ্জয়? কিন্তু একটু ভেবে দেখ মোটেই অদ্ভুত নয়। আইনস্টাইনের কাছ থেকে নামটি পেয়েছি। তিনি যে তত্ত্ব দিয়েছেন সময়, স্থান, ভর ও বেগের—এর প্রতিটি কথার প্রথম বর্ণগুলো তুলে নিয়ে মিশিয়ে ওর এই ধরনের নাম দিয়েছি। বল ত, সত্যিই কি এতে কোন অন্যায় হয়েছে আমার, না ভুল করেছি আমি?

আমি বললামঃ ভুল বা অন্যায় মোটেই নয়। বরং উপযুক্ত নামই তুমি বাছাই করেছ ওর কাজ অনুসারে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আজ আমরা যেখানে যাবার চেষ্টা করছি বিবর্ত সেনের এই কাজ তারই সেরা দৃষ্টান্ত।



সম্ভাভবে···নামটা বড় অদ্ভুত, তাই না সঞ্জয় ?

আমরা যখন সম্ভাভবের চিন্তা নিয়ে মশগুল হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক সেই সময় সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চা-জলযোগের ট্রেটা বাড়িয়ে দিয়ে মিহি স্বরে বলল ঃ নিন চা খান।

আমি বললামঃ আচ্ছা বিবর্ত, ও জানল কি করে আমরা এখন চা খাব। তুমি ত শুধু ওকে ডেকেছ। কিছুইতো ওকে বল নি।

ঃ না বলি নি। বলারও দরকার নেই। শুধু ভেবেছি চা খাওয়া দরকার। আর সেই ভেবেই ওকে ডেকেছি। ব্যস!

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমি শুধু বললাম ঃ বাঃ, বেশ মজা ত!

আরো মজা তখনো বাকি।

যে বিশেষ কারণে আমার বিবর্ত সেনের কাছে আসা, তা বিস্তারিত খুলে বললাম ওকে।

কলকাতা শহর থেকে প্রায়ই একটা বিশেষ ধরনের জিনিস চোরাই পথে বিদেশে যাচ্ছে। রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর এবং কাস্টমস বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কিভাবে যে ঐ জিনিস তাদের চোখের সামনে দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে, সত্যিই তা অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা যাকে সন্দেহ করেছে তাকে কয়েকবার ভালভাবে চেকও করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে মালটাও। কিন্তু সত্যিই ভৌতিক ব্যাপার! কিছুই মিলল না। অথচ তারপরের দিন খবর পাওয়া গেল সেই জিনিসই ও পাচার করেছে ওদের চোখের সামনে দিয়ে।

শেষমেশ আমি বললাম ঃ দেশের স্বার্থে এ রহস্য আমায় ভেদ করতেই হবে। তুমি আমায় সাহায্য কর বিবর্ত।

ঃ তুমি ডঃ সিন্‌হার কথা বলছ? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল বিবর্ত।

ঃ ঠিক ঠিক। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? দারুণভাবে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ঃ আরে উনি ত একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ।

ঃ তাই নাকি! তাহলে ওর মত একজন লোক কি করে এমন ঘৃণিত কাজে লিপ্ত থাকতে পারে?

ঃ টাকা টাকা। টাকার জন্যে ও ভদ্রলোক হেন কাজ নেই যে করতে পারে না। ওকে আমি অনেক দিন থেকেই জানি। মাঝে একবার সাবধানও করে দিয়েছিলাম। চুপচাপও ছিল বেশ কিছুদিন।

কিন্তু আবার দেখছি স্বমূর্তি ধরেছে। এসব লোককে আমি ঘৃণা করি সঞ্জয়।

ঃ ঘৃণা করবার মতই লোক।

ঃ সেজন্যে নয় সঞ্জয়। বিজ্ঞানকে যে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের আমি সহ্য করতে পারিনে। ওর বিজ্ঞানের যাদুটা কি জান? বিবর্ত সেন ডঃ সিন্‌হার বৈজ্ঞানিক কৌশলটা বলল ঃ ওর যে থলেটা তোমরা চেক করেছ, সেই থলেটাই কিন্তু আসল।

অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম ঃ কী রকম?

বিবর্ত বলল ঃ ঐ থলেটা বিশেষভাবে তৈরি। থলেতে একটা অদৃশ্য বোতাম আছে। গণিতের মাপে সেটা বিশেষভাবে বসানো। প্রয়োজনে বোতামটা টিপে দিলেই থলের মুখটা খুলে গিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় হাইড্রোজেন। থলেতে হাইড্রোজেন ভর্তি হলে তা ফুলে উঠবে এবং হালকা হয়ে যাবে বেলুনের মত। বল, তোমরা যখন চেক করেছ তখন থলেটাকে ফোলানো অবস্থায় দেখতে পাও নি? এবং সেটা ধরেই বুঝেছ সেটা হালকা এবং যে বিশেষ জিনিসটা সে নিয়ে যাচ্ছে সেটা যে ওর মধ্যে থাকতে পারে তা তোমাদের মাথায়ও আসেনি। কী তাই কিনা?

ঃ ঠিক, ঠিক বলেছ বিবর্ত। কিন্তু ওতে যদি হাইড্রোজেন থাকে তবে সেটা বেলুনের মত উড়েও ত যেতে পারত।

হেসে বিবর্ত বলল ঃ বাহাদুরি ত ওর এইখানেই। ব্যাগের মধ্যে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বসানো আছে। হাইড্রোজেন গ্যাস ঢুকে ম্যাগনেটাকে দেয় চালিয়ে। ফলে আর সেটা উড়তে পারে না। আর ওজন করতে গেলেও সেটার কোন ওজনও ধরা পড়ে না। ও এইভাবে তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন ওর চোরাই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঃ সবই ত বোঝা গেল এতক্ষণে। ওকে এখন হাতেনাতে ধরা যায় কিভাবে? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে জানতে চাইলাম।

ঃ ঠিক আছে। আগামী পরশু দিন ওকে তোমরা ধরতে পারবে হাতেনাতে। সম্ভাভবে যাবে ওকে ধরিয়ে দিতে। তবে দেখ, ওকে যেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করে, কিংবা বিরক্ত না করে। তবে কিন্তু সব পণ্ড হয়ে যাবে। আর উল্টে বিপদেও পড়তে পার তোমরা। ওকে চালাতে হিসেবের একটু ভুল হলেই কিন্তু সর্বনাশ।

আলোচনা শেষে আমি বেরিয়ে আসছিলাম হঠাৎ একটা বিরাট গর্জনে আমার পিলে চমকে যাবার দাখিল। জিজ্ঞেস করলাম বিবর্তকে ঃ অমন বিকট আওয়াজটা কিসের ?

ঃ সম্ভাভবে বোধহয় বাগদাদ থেকে মিশর হয়ে বেড়িয়ে ফিরে এল। আর এসেই বোধহয় ছোট ভাই সসেমিরার সঙ্গে গণ্ডগোল জুড়ে দিয়েছে।

এমন উদ্ভট কথা শুনে ত আমার চক্ষুস্থির। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, সসেমিরা আবার কে ?

প্রশ্নটা করতে না করতেই দেখি একটা মৌমাছি ভীষণ শব্দে গুঞ্জন তুলে পাখা মেলে উড়ে এসে বসল একেবারে বিবর্ত সেনের কাঁধের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ আরে আরে, মৌমাছিটা যে তোমায় কামড়ে দিল !

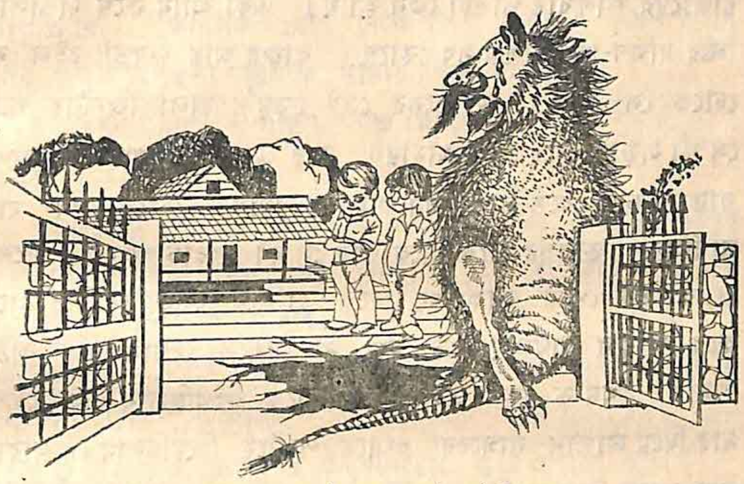
সে আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ ভয়ের কিছু নেই সঞ্জয়। ও কামড়াবে না। সেই বিক্রমাদিত্যের কালও আজ আর নেই, কামড়াবার ক্ষমতাও ওদের নেই। ও, হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে তুমি ? সসেমিরা কে জানতে চেয়েছিলে তুমি, তাই না ? এই মৌমাছিই সেই সসেমিরা। ভয়ানক দুরন্ত ও। সম্ভাভবে কেন ওকে একলা রেখে বেড়াতে চলে গেছে, তাই হয়েছে ওর রাগ। তাই ওর সঙ্গে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছিল ও। আর একটু দেরি হলেই কিন্তু রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। তাই ওদের ঝগড়া আর বেশি দূর বাড়তে না দিয়ে ওকে মৌমাছি বানিয়ে দিলাম। এখন বুঝুক ঝগড়া করার কি রকম শাস্তি।

বিবর্ত সেন যখন ওর সম্বন্ধে এইসব কথা বলছিল, তখন ও আরো কয়েকবার গুঞ্জন করে আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়াল। বিবর্ত বলল : দেখেছ শয়তানটার চালাকি! ও কিন্তু বারে বারে আমায় বলছে, ওকে আবার সসেমিরার রূপে ফিরিয়ে দিই। ও আর সম্ভাভবের সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

আমি বললাম : তাও যখন বারবার করে বলছে, তখন দাও না আবার ওর পূর্ব রূপ ফিরিয়ে।

: কিন্তু মুশকিল কি জান? কোন জিন যদি মৌমাছি হয়, তবে কম পক্ষে তিন দিন লাগবে ফের তাকে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দিতে। তোমাদের তাল-বেতালের যাদুতত্ত্বের মজাই ত এখানে। হ্যাঁ, তুমি ত তা সসেমিরার পরিচয় জানতে চেয়েছিলে তাই না? তাল-বেতালের গল্প শুনেছ ত? সসেমিরা ওদেরই বংশধর। তবে জাতগোত্রে ও হচ্ছে জিন। জান ত আগেকার দিনে শক্তিমান রাজারা সব জিন পুষতেন। ওদেরই আমরা অপদেবতা বলি। প্রাচীন ইউরোপে, বাগদাদ-মিশর-ভারতে-চীনে ওদের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। এক এক দেশের জিনদের এলাকা ছিল ভাগ করা। কেউ কারুর এলাকায় ঢুকতে পারত না। তখনকার রাজারা যুদ্ধ আর আকাশ-বাতাসের খবরাখবর নিতেন এদেরই সাহায্যে। আজকাল যেমন তোমরা বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদির সাহায্যে খবরাখবর আদানপ্রদান কর। এখন ওদের বেতারের দৌলতে হয়েছে সর্বনাশ। কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না বিশেষ। ভারতীয় জিনদের দুটো সেরা জিনকে তাই আমি বহু কষ্টে উদ্ধার করে তাদের আধুনিকীকরণ করে রেখে দিয়েছি আমার কাছে। নানান কাজকর্ম করাই ওদের দিয়ে এবং সব থেকে বড় কথা মানুষের কাজে যদি ওদের লাগান যায় সেই গবেষণাতেই আছি এখন। আচ্ছা অনেক রাত হল আজ। আরেক দিন এস। আরো নতুন কিছু বোধ হয় তোমাকে দেখাতে পারব।

নতুন আর দেখব কি। ভয়ে তখন আমার ভিরমি খাওয়ার মত অবস্থা। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ সেখানকার পায়ের তলার মাটি উঠল কেঁপে। আর ভীষণ গর্জন করে আমাদের



ভীষণ গর্জন করে সামনের মাটি গেল ফেটে চৌচির হয়ে। সেখান থেকে ফুঁড়ে উঠে এল বীভৎস এক জীব।

সামনের মাটি গেল ফেটে চৌচির হয়ে। সেখান থেকে ফুঁড়ে উঠে এল বীভৎস এক জীব। যেমন লম্বা তেমনি মোটা। তার ওপর মুখখানা তার নেকড়ে বাঘের মত এবং মুখে বিরাট দড়ির মত পাকানো এক গোঁফ।

বিবর্ত সেন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল : হঠাৎ এ সময়ে কী মনে করে চ্যাঙকো ?

ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল সেই চ্যাঙকো নামে বিচিত্র জীবটি।

সমবেদনার সুরে বলল বিবর্ত : কান্নাকাটি না হয় পরেই কর। আগে বলেই ফেল না ব্যাপার কী ?

চ্যাঙকো চোখের জল মুছতে মুছতে বলল : সেই তাঙ রাজাদের আমল থেকে আছি চীনের রাজপ্রাসাদে। ছিলামও এতদিন বহাল তবিয়তে। দেশটাকে বাঁচিয়েছিলামও অন্য দেশের অনেক

অপদেবতাদের হাত থেকে। মনে আছে তোমার, সেই যে ইংরেজ আমলে এক বিরাট দুর্ভিক্ষ এল দেশে, তখন চীনের আকাশে নানান দেশের কত না অপদেবতার মহোৎসব লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তাঙ রাজাদের আশীর্বাদ পাওয়া জিন আমি। একা আমি রুখে দাঁড়ালাম উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম সব কোণে। কারুর আর ক্ষমতা রইল না ঢোকে সে দেশে। জাপানের সেই চতুর্মুখওয়ালা জিনটার সঙ্গে সে কী লড়াই বেধে গেল আমার। তার এক এক নিশ্বাসে আকাশ-বাতাস ছেয়ে যেতে লাগল ঘন কালো ধোঁয়ায়। চোখে দেখা যায় না কিছু। তারপর মাঝে মাঝে তার সে কী বিরাট গর্জন! দেশের লোক ভয় পেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কন্‌ফ্যুসিয়াসের নামে করে আকুল প্রার্থনা! সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন দাদা। তখন ত একলা এই আমিই তাকে রুখেছিলাম এবং বেদম মার দিয়ে জাপান সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যাবার সময় তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েও নিয়েছিলাম জীবনে সে আর এখানে আসবে না। এই না দেখে তার পিছু পিছু আর আর সব জিনরা পিটটান দিয়েছিল। আর আজ কিনা চীনের প্রজাতন্ত্রী সরকার আদেশ দিয়েছে, আমার নাকি ভারতবর্ষের জিনদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব আছে, সেই অপবাদে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অনেক ভেবে দেখলাম, কি করি। শেষে দেখলাম তোমার কাছেই আসা যেতে পারে। কেননা তাল-বেতালের বংশধরদের ত তুমি তোমার শিষ্য করে নিয়েছ। দেখলাম, আমার দুঃখ কেবল মাত্র তুমি ছাড়া আর কেউই বুঝবে না। আর সব দাদারা (যাদুকর) তো সব ধান্দাবাজ। তাই যদি ওদের মত আমায়ও তোমার শিষ্য করে নাও, তবে এ দাস তোমার পায়ে পড়ে থাকবে চিরকাল।

আমি ত অভিভূত হয়ে সব শুনছিলাম। চ্যাঙফোর একটি কথাতেই শুধু আমি হেসে উঠেছিলাম একটিবার—যখন ও বলছিল,

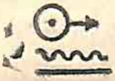
ভারতের জিনদের সঙ্গে যেহেতু ওর খুব দহরম-মহরম, সেই অপবাদেই আজ ও গৃহহারা।

অগত্যা বিবর্ত সেন বলল : তা কি আর করা যাবে চ্যাঙফো। ওদের সঙ্গে সন্ধি করে যদি তুমি থাকতে পার, তবে আর আমার আপত্তি কি। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল : দেখলে ত সঞ্জয়, অন্ধ স্বার্থপরতা মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায় ?

: তখন মানুষ তো মানুষ, অদৃশ্য জিনদেরও রেহাই নেই।

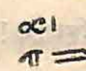
: ঠিকই বলেছ সঞ্জয়।

খবর পেয়ে ততক্ষণে সস্থাভবে এবং সসেমিরা এসে চ্যাঙফোর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে সেকী আলাপ আর হাসিঠাট্টা। ওদের সাংকেতিক ভাষা ত আমি বুঝি না। বিবর্ত সেন সব বুঝিয়ে দিল আমায়। দু-একটি নমুনার বাংলা তর্জমা আমি তোমাদের জন্যে এখানে দিলাম, পড়ে আনন্দ পাবে বলে।



= কখন কোথা থেকে কেমনভাবে তুমি এখানে এলে ?

= সেবার সেই যে মিশরের ক্যারোদের রাজপ্রাসাদে আন্তর্জাতিক জিন সম্মেলন হয়েছিল, তাতে তুমি কত না অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলে, মনে আছে সে কথা ?



= অবশ্যই আছে।

= আমাদের বর্তমান ভবিষ্যৎ ভাই সত্যিই অন্ধকার।

আচ্ছা বল ত, এইসব সাংকেতিক চিহ্নগুলোর সবই আমাদের গণিত শাস্ত্রের কোন না কোন অর্থজ্ঞাপক চিহ্ন নয় কি ? ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত তাই না ?

তারপর দুয়েকটি মামুলি কথাবার্তার পর আমি বিদায় নিলাম সেদিনকার মত।

তিন

সেদিন চান করে সবে ঘরে ঢুকেছি। হঠাৎ একটা মাছি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরতে ঘুরতে সারা ঘরময় কয়েকবার পায়চারি করে ঠিক আমার টেবিলটার উপর গিয়ে বসল। তারপর তার ডানা দুটো ঝাপটাতে লাগল।

এই অবেলায় মাছি! আমি ভয়ংকর বিরক্তবোধ করে একটা ঝাঁটা নিয়ে সেটাকে যেই তাড়াতে যাব, অমনি সে আমার সামনে মানুষের রূপে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল: আপনার বন্ধুর আদেশ, আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি যাবেন। জরুরী নেমতন্ন আছে সেখানে আপনার। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অনেকেই আসবেন। আচ্ছা চলি।

মুহূর্ত মধ্যে যে লোকটি কথা বলছিল, সে আবার মাছিতে পরিণত হয়ে বোঁবোঁ শব্দে জানালার ফাঁক দিয়ে উড়ে চলে গেল।

আমি ত কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। চোখের পলকে কি যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল, ভাববার চেষ্টা করছিলাম! কিছুক্ষণ বাদে সব বুঝতে পারলাম, আমার বন্ধু বিবর্ত সেন দূত সসেমিরা মারফৎ আমায় নেমতন্ন পাঠিয়েছে আজ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যাবার জন্যে।

সন্ধ্যার একটু আগেই রওনা দিলাম। পৌঁছলাম এসে বিবর্ত সেনের বাড়িতে।

কিন্তু এ কি অবাক কাণ্ড! এই কি সেই বাড়ি? এ রকম ত নয় বিবর্ত সেনের বাড়িটা! না, এখানেই ত ছিল তার বাড়িখানা! আশেপাশে তাকিয়ে দেখে বাড়ির অবস্থানটা যাচাই করতে চাইলাম।

হ্যাঁ, তাই ত সবই ঠিক আছে! এখানেই ত ছিল তার বাড়িখানা! কিন্তু এ বাড়ি ত নয়! এ আবার কোন ধাঁধায় পড়লাম রে বাবা!

ফিরে যাব কি যাব না—এই যখন ভাবছিলাম তখন চ্যাঙফো এসে আমার সামনে অভিবাদন করে দাঁড়াল। বলল: আপনি কি বিবর্ত সেনের বন্ধু সঞ্জয়বাবু?

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সে বলল: আসুন আমার সঙ্গে। আপনার বন্ধু অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

সেই একদিনই শুধু দেখেছিলাম চ্যাঙফোকে। মনে থাকারও কথা নয়। কিন্তু তার সেই পূর্বেকার লাল জোব্বা পোশাক দেখে এবং বিচিত্র সেই চেহারা দেখে মনের দ্বন্দ্ব গেল ঘুচে। আর সঙ্গে সঙ্গে চললাম তার পিছু পিছু।

ঘরে ঢুকতেই দেখি বিবর্ত সেন অনর্গল বকেই যাচ্ছে তার সামনে বসে থাকা এক অদ্ভুত ধরনের জীবের সঙ্গে। আমাকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে এল আমার কাছে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল সেই বিচিত্র জীবের সামনে। তারপর বলল: এস সঞ্জয়, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি মিশরের টুট্‌নখামেনের সময়কার স্ফিনিক্স। মুখটা এঁর মানুষের মত, আর দেহটা সিংহের মত। অসীম ক্ষমতা এঁর। ইনি একাধারে দেবতা আবার অপদেবতাও বটে। প্রাচীন মিশরীয়দের উন্নতির যত কিছু মূল কিন্তু ইনিই। বাইরের শত্রুদের হাত থেকে মিশরকে বাঁচানোর প্রধান কৃতিত্ব কিন্তু এঁরই। কিন্তু কালে কালে মিশরবাসীরা ভুলে গেল এঁকে। আর নিজেদের সর্বনাশও ডেকে আনল সঙ্গে সঙ্গে।

পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে গিয়ে বিবর্ত সেন পরিচয় করিয়ে দিল তিন যক্ষের সঙ্গে। দেখলাম, তারা তিন জন পরস্পর কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আমাকে দেখে একটু যেন অখুশিই হল।

অগত্যা আমায় অভিবাদন করে আবার নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করল।



—ইনি মিশরের টুটেনখামেনের সময়কার স্ফিনিক্স।···অসীম ক্ষমতা এর।

বিবর্ত বলল: তোমাদের আধুনিক জগতে আর এদের স্থান হচ্ছে না। লোকে আর বিশ্বাস করতে চায় না ওদের। সে রামও নেই, আর অযোধ্যাও নেই। সেইসব দুঃখের কথা আলোচনা করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। এরই মধ্যে যে যক্ষটি বসে আছে, সে এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোন আমলের। মহারাজ শশাঙ্কের রাজ-পরিবারের গোপন ধনসম্পদ পাহারা দিত ও। তা একদিন হল কি—তোমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল গবেষক গেলেন কর্ণসুবর্ণতে। খুব খোঁড়াখুঁড়ি করে তারা বার করল রাজপরিবারের ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বাড়িখানা। বিশেষ কিছুই তারা পেল না বটে। তবে

কয়েকটা দেবমূর্তি আর একটা বিরাট কালো মাটির কলসী—সোনা দিয়ে তার মুখ বাঁধান এবং মুখে আঁকা ত্রিশূল হাতে একটা যক্ষের মূর্তি। অনেক চেষ্টা করেও তারা মুখটা খুলতে পারল না। সেই অবস্থায় তারা কলসীটাকে নিয়ে এল কলকাতার মিউজিয়ামে। রাতে সেই কয়জন গবেষক স্বপ্নে দেখল, যক্ষ বলছেঃ তোমরা খুব অন্যায় করলে আমার ঘুম ভাঙিয়ে। যাক, তবু তোমাদের নিষেধ করছি কলসীর ঐ নিষিদ্ধ ধন তোমরা বার করতে চেষ্টা কর না। বহুদিন থেকে আমি পাহারা দিচ্ছি। মুসলমান শাসনেও আকরর একবার চেষ্টা করেছিলেন এই কলসীটাকে দিল্লী নিয়ে যেতে। কিন্তু পারেন নি। উল্টে তার সঙ্গের বহু লোক মারা পড়েছিল আমার গায়ে হাত দেয়ার জন্য। ইচ্ছে করে তোমরা তোমাদের বিপদ ডেকে এনো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা? পরের দিন তাদের মধ্যে একজন যন্ত্রপাতি নিয়ে যেই কলসীটার মুখ খুলতে গেছে অমনি তার মাথাটা খসে পড়ে গেল ধড় থেকে। সেখানে আরও যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এই না দেখে দে ছুট। সেখানে তখন দারুণ হৈ চৈ! সেই থেকে ঐ অবস্থায় আমি পড়ে আছি মিউজিয়ামে একটি তালাবন্ধ ঘরে। কিন্তু আর বোধ হয় থাকা যাবে না। বয়েসও ত অনেক হল। এখন বিজ্ঞানের যা উন্নতি হচ্ছে, তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বোধহয় আর পারব না। মাঝে মাঝে শুনি, আমাকে এক সূক্ষ্ম উপায়ে ভেঙে ফেলার এক দারুণ চক্রান্ত হচ্ছে। তাই ও এসেছে আমার সাহায্য চাইতে। আচ্ছা সঞ্জয়, বল ত কি সাহায্য আমি ওকে দিতে পারি? ও একলা এতসব অমূল্য ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছে সেই অনন্তকাল ধরে, তাকি ওর দেয়া উচিত। এত ধনসম্পদ পেলে দেশের মানুষের কতনা উপকার হত বলত? একজন সব সঞ্চয় নিজের কুক্ষিগত করে রাখবে, আর দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে তাকি কখনো উচিত? তবু ও আমার সাহায্য চায়। কী যে করি?

তারপর ওর ডাইনে-বাঁয়ে আর যে তুজন যক্ষকে দেখছ, ওরা কিন্তু গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের। জানই ত সুলতান মামুদ ওই মন্দির যখন লুট করে তখন কিন্তু বিধর্মীর ছোঁয়া বাঁচাতে ওরা পালিয়ে গিয়ে উঠেছিল চিতোরের রাজপরিবারে। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হল না। আলাউদ্দীন খিলজি যখন চিতোর অভিযান করেন, তখন ওরা পালিয়ে কাশ্মীরের জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে ওরা সেখানে আছে। বহু চেষ্টা করছে ওরা লছমনঝোলাতে যেতে। কিন্তু সেখানকার যে ত্রিকালজ্ঞ যক্ষটা আছে, সে কিছুতেই ওদের প্রবেশাধিকার দিতে চাচ্ছে না। বহুদিন ধরে ত সে সেখানে মৌরসীপাট্টা নিয়ে আছে। সেখানে আবার তুজন ভাগীদার যদি বাড়ে, তবে তার যে অসুবিধা। তাই সে কিছুতেই ওদের সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। আজ একশ বছর ধরে ওরা খুব চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। ওরাও তাই আমার সাহায্য চায়। তুমি ত জান সঞ্জয়, এই সব ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াইয়ে আমি ত কোন পক্ষই নিতে পারি না। আমি কিছু করতে পারব না বলে এর আগে ফিরিয়েও দিয়েছি কয়েকবার। কিন্তু একেবারে নাছোড়বান্দা ওরা। এখন কি যে করি কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না!

মুখ ফসকেই যেন কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ঃ আচ্ছা বিবর্ত, আজকাল ত পৃথিবী থেকে যক্ষের ধন পাহারা দেবার কাল ক্রমশ শেষ হতে চলেছে। তুমি তোমার যাতুর মায়ায় আমাদের দেশটাকে এই সব যক্ষদের হাত থেকে মুক্ত করে ফেল না কেন! তাহলে ত ভাই একটা কাজের মত কাজ হয়।

ঃ মুখে বলা ভাই যত সহজ কাজে করা কিন্তু তত কঠিন। আমিও কি ভাবি নি মনে করেছ? কিভাবে তা করা যায় তাই নিয়েই যে ভাবছি দিন রাত। পৃথিবীর যাতুশাস্ত্রে অবশ্য এর কোন নির্দেশ নেই। তবে গোপন একটা যাতুতত্ত্বের বই সম্প্রতি আমি

পেয়েছি—আমার একজন বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে। সেই অনুসারে দেখছি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা। পরে তোমাকে বলব সব। এখন চল ঘর থেকে সামনের বাগানে যাওয়া যাক।

বাগানে এসে দেখি, যেন এক হট্টমেলা বসে গেছে! একদল ছেলেমেয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড জুড়ে দিয়েছে।

বিবর্ত তাদের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল ঃ বেশ লাগে কিন্তু এই সব ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকতে। এত নিষ্পাপ বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তোমাদের রবিঠাকুর তাই বোধহয় এদের নিয়ে সেই যে কি একটা কবিতা লিখেছিলেন—

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা॥

ঠাট্টার সুরে আমি বললাম ঃ যাদুকরের দেখছি কাব্যরসতো কম না!

বিবর্ত সেন হাসি মুখে তাকাল আমার দিকে।

ছেলেরা সব ছুটোছুটি করতে করতে এসে আমাদের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর বিবর্তকে বলল সবাই একসঙ্গে ঃ আমাদের আজ ইচ্ছেখুশির দেশে নিয়ে যেতে হবে। তুমি রোজ আমাদের ফাঁকি দাও। আজ কিন্তু ছাড়ব না।

চ্যাঙফো এবং সসেমিরা ওদের কিছুতেই থামাতে পারছে না।

বিবর্ত সেন ওদের দুজনকে নিষেধ করল থামতে। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আজ আর কাউকে ফাঁকি দেব না। বল, কে কি হতে চাও?

ওদের মধ্যে সব থেকে ছোট যে ছেলেটি সে লাফাতে লাফাতে বলল ঃ আমাকে পরী বানিয়ে দাও। পরী হয়ে আমার খুব আকাশে ওড়ার শখ।

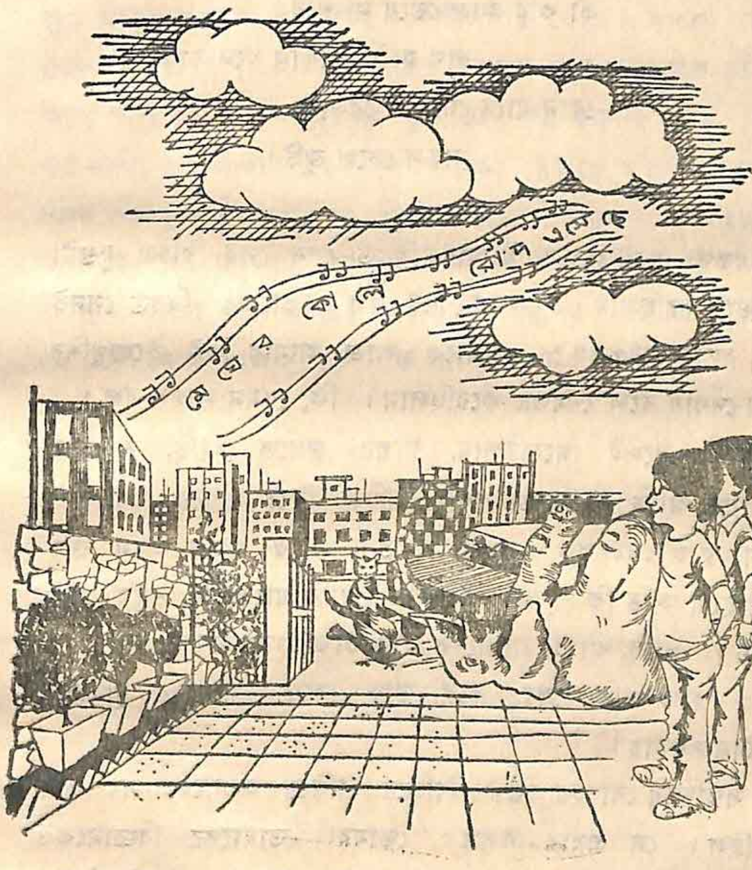
বিবর্ত ছেলেটাকে কাছে ডেকে আদর করে বলল ঃ আচ্ছা তবে তাই হোক!

অমনি ছেলেটি সুন্দর একটি পরী হয়ে আমাদের মাথার উপর উড়তে লাগল।

তারপর একে একে যার যার খুশি মতো কেউ হল মোটর গাড়ি, কেউ হল হাতি, কেউ হল ময়না পাখি, কেউ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেউ হল রাক্ষসরাজ রাবণ, আবার কেউ বা হল মিনি বিড়াল। তখন সেখানে সে এক বিচিত্র ব্যাপার। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

মোটরগাড়িটা বোঁ বোঁ শব্দে সারা বাগানে ছুটতে লাগল। হাতিটা গদাইলস্করি চালে চলতে চলতে এক সময় ত মোটরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই গেল উল্টে পড়ে। ময়না পাখি তখন গাছের ডালে বসে গান গাইছিল। হাতিটাকে উল্টে পড়ে যেতে দেখে সে এল ছুটে গাড়িটাকে আটকাতে। কিন্তু ছোট্ট ময়না পারবে কেন? বরং অল্পের জন্য চাপা খেতে খেতে বেঁচে গেল। ভীষণ রেগে গেল তাতে মিনি বিড়ালটা। এতক্ষণ সে এখানে ওখানে ওৎ পেতে বেড়াচ্ছিল দু-চারটে ইঁদুরের খোঁজে। এখন সে মিঁউ মিঁউ ডাক ছাড়তে ছাড়তে রেগে তেড়ে এল গাড়িটাকে রুখবে বলে। পড়ল একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা এবার বাধ্য হয়ে থেমে পড়ল। তখন সে কি হৈ চৈ। রাবণ রাজা ত দশ মাথা নিয়ে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন কি করে রামকে বধ করা যায়, সেই চিন্তায়। তিনি তরোয়ালগুলোর ধার ভাল করে পরীক্ষা করছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি গেলেন রেগে। এলেন তেড়ে সেখানে। হাঁক ছাড়লেন ঃ কী হয়েছে রে? এত গোল কিসের এখানে? দেখছিস্ না এখুনি রাম-রাবণে যুদ্ধ হবে। ফের গোলমাল করলে সবকটাকে এই তরোয়াল দিয়ে খতম করে দেব। সাবধান! ভয় পেয়ে এবার সবাই যে যার কেটে পড়ল যে যেদিকে পারল। আবার খেলা শুরু হল।

ও, রবি ঠাকুরের কথা বলতেই ভুলে গেছি। সে এতক্ষণ বাগানের এক জায়গায় বসে বসে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, বৃক্ষ লতাপাতার দিকে তাকাচ্ছে, আর আপন মনে আবৃত্তি



—কী হয়েছে রে? এত গোলমাল কিসের?

করে যাচ্ছে নানা কবিতা। বাগানে গাছের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। তখন শরৎকাল। রবি ঠাকুর সেই রোদ্দুরটা দেখেই আনন্দে নাচতে নাচতে গাইতে লাগল—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে আমি আর বিবর্ত সেন সেই বিচিত্র দৃশ্যটা উপভোগ করছিলাম। বহুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। বিবর্ত সেনই কথা বলল সর্বপ্রথম: তোমাকে আজ আমার এই ইচ্ছেখুশির মেলা দেখাব বলে নেমতন্ন করেছিলাম। কি, কেমন লাগল বল?

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, স্বপ্নের জগতে আছি, না এই পৃথিবীতে আছি। বিবর্তর কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম: আমাদের জীবনটা বড় একঘেয়ে বিবর্ত। মাঝে মাঝে এমন রুচি বদল হলে ক্ষতি কি? আমি আজকাল মাঝে মাঝে কি ভাবি জান বিবর্ত? ভাবি, আহা, আমাদের জীবনটাও কেন এমন হয় না।

: হতে পারে সঞ্জয়, তবে তার জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান দরকার।

সম্ভাভবে বোধহয় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছিল। সে এবার বলল: তোমরা তোমাদের বিজ্ঞানকেও মান না! তাই ত আজ আমার এই দুর্ভোগ। আইনস্টাইন দাদাকে কিছু দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তাতে লিখেছিলাম: তুমি ত আমায় এই পৃথিবীতে আনলে। আমার মহিমা তো দেখছি একমাত্র তুমিই বুঝলে, আর বুঝেছে বাংলা দেশের সত্যেন বোস। কিন্তু পৃথিবীর আর আর মানুষ ত আমায় কিছুই

বুঝল না। ফলে আজ আমায় উপেক্ষা আর অবিশ্বাস নিয়ে শুধু তোমারই জন্যে এই পৃথিবীতে রয়ে যেতে হল। কবে যে আমার সুদিন আসবে, তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যি, সস্থাভবে বলেছে ঠিক। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে আমরা আজও আমাদের রক্ষণশীলতার বেড়া, সংস্কারের বেড়া ভাঙতে পারি নি। আমাদের মনের চিন্তাকে আর ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পারি নি উদার আকাশের যুক্তিগ্রাহ্য স্বপ্ন-কল্পনার মাঝে। তাই স্বপ্ন-কল্পনা স্বপ্ন-কল্পনাই রয়ে গেল। কিন্তু সেটাকে আজও বাস্তবে সম্ভব করে তুলতে না নিলাম কোন উদ্যোগ, না করলাম কোন চেষ্টা। তাই আমাদের জীবনটা আজও মরুভূমির মত শুষ্কই রয়ে গেল। ঐ ছেলেগুলোর মত আমরা বুড়োরা ইচ্ছেখুশির মেলাতে পাখির মত ডানা মেলে আজও উড়ে যেতে পারলাম না।

চার

বিবর্ত সেন নিজের গবেণাগারে তৈরি ছোট্ট একটা যন্ত্র আমায় উপহার দিয়েছিল। বলেছিলঃ নে, এটা তোকে দিলাম। যখন প্রয়োজন, তখন এর লাল বোতামটা টিপবি, সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছোট্ট পর্দাটায় যাকে তুই চাস তার মুখটাই ভেসে উঠবে ; আর সঙ্গে সঙ্গে কালো বোতামটায় আঙুলটা রেখে তার সাথে তোর প্রয়োজনীয় আলাপ শুরু করবি।

কথাগুলো আপন মনেই শেষ করে কি একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে।

আমি উঠছিলাম অনেক বেলা হয়েছিল বলে। কিন্তু কেমন ম্যাজিকের মত ও আমাকে এই কথাগুলো বলে এবং ছোট্ট যন্ত্রটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে কেমন পাথরের মত স্তব্ধ করে দিল আমায়। আমি যেন হিম হয়ে ভেতরে ভেতরে কেমন ঘামতে শুরু করলাম বিবর্তর ওই ধরনের অবিশ্বাস্য কথা শুনে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি বসে পড়ে ওকে বললামঃ এটা কি তাহলে পৃথিবীর শেষ আশ্চর্যতম সৃষ্টি তোর ?

স্মিত হেসে ও বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললঃ তা কেন, বিজ্ঞানে আশ্চর্যের কি শেষ আছে ? টেলিফোন-টেলিগ্রাফ যখন আবিষ্কার হল, তখন ত এই পৃথিবীর গোঁড়া মানুষের দল বলতে শুরু করেছিল, ওটা একটা ভৌতিক ব্যাপার।

ঃ না রে, তেমন ব্যঙ্গ আমি তোকে করতে চাই নি।

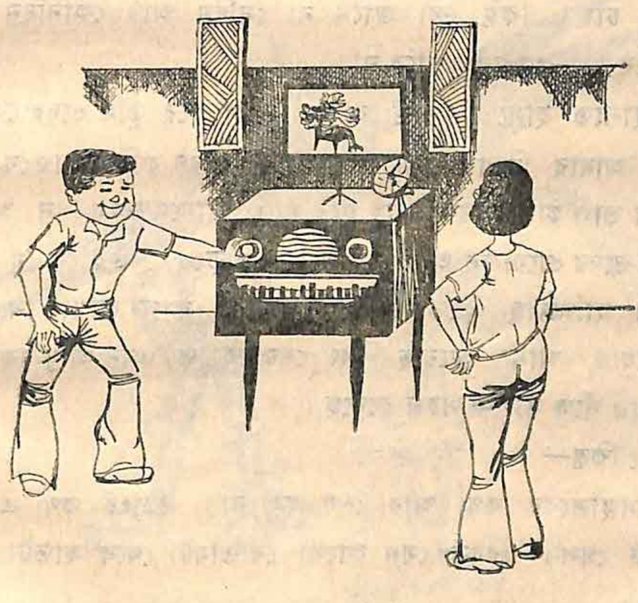
ঃ ব্যঙ্গের প্রশ্ন নয় সঞ্জয়। বিজ্ঞান আর মানুষের মনীষা যদি ঠিক

ঠিক উচ্চগ্রামে পৌঁছতে পারে তাহলে আগামী পৃথিবী সত্যিই একদিন কল্পনার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

ঃ ঠিক বলেছিস বিবর্ত। একরকম প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম আমি ঃ আমাদের বেদ-পুরাণে ত এরকমভাবে যোগাযোগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাই না ?

ঃ তা কতকটা এই রকমই বটে। বিবর্ত হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল এবং আমার হাত থেকে যন্ত্রটা নিজের হাতে নিয়ে বলল ঃ ত্থাখ, এখুনি তোকে এই যন্ত্রের ক্ষমতা দেখিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত যন্ত্রটার লাল বোতামটা টিপল। পাশের সাদা পর্দায় মুহূর্তে ওর দূত সম্ভাভবের বিশেষ মূর্তিটা ফুটে উঠল। দেখা



—সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত যন্ত্রটার লাল বোতামটা টিপল। পাশের সাদা পর্দায় ......দূত সম্ভাভবের বিশেষ মূর্তিটা ফুটে উঠল।

গেল, সম্ভাভবে বিশেষ এক ভঙ্গীতে ভিয়েনা শহরে জিনদের আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে সভাপতির আসনে বসে আছে। বিবর্ত কালো

বোতামটায় হাত রেখে কথা শুরু করল সম্ভাভবের সঙ্গে ঃ খবর কি সম্ভাভবে? শান্তি সম্মেলন তোমাদের কেমন চলছে?

সম্ভাভবে হাসতে হাসতে জবাব দিল ঃ ভালই চলছে—তবে কি জানেন, সসেমিরা এবং চ্যাঙফো বড়ই জ্বালাতন করছে।

কৌতূহলী হয়ে বিবর্ত জানতে চাইল ঃ কেন, কি আবার নতুন উৎপাত শুরু করল ওরা?

ঃ ওরা নতুন যুগের বিজ্ঞানের অবদানের সঙ্গে কিছুতেই আপোস করতে চাইছে না।

ঃ কেন, কি চায় ওরা?

ঃ ওরা সেই ওদের আদ্যিকালের পৃথিবীর আলো হাওয়ায় ফিরে যেতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না সেদিন আর কোনদিন ফিরে আসবে না—আসতেও পারে না।

হাসতে হাসতে বিবর্ত বলল ঃ ভাল করে তুমি ওদের বোঝাও এবং আমার চিন্তার কথা ওদের ফের স্মরণ করিয়ে দাও যে, এতে ওদের ভাল ছাড়া খারাপ কিছু হবে না। সামনে এমন দিন আসছে, যখন ওদের প্রয়োজন আরও বেশি করে বাড়বে। এই যে, যে যন্ত্রটা আমি বানিয়েছি, এতে ত শুধু তোমাকে কাজে লাগাই নি, ওদের সাহায্যও আমি নিয়েছি এবং সেজন্যই ত এমন আধুনিক যন্ত্রটা আমার পক্ষে বানান সহজ হয়েছে।

ঃ কিন্তু—

সম্ভাভবের কথা আর শেষ হল না। হঠাৎই কথা এবং দৃশ্য কেটে গেল। বিবর্ত সেন কালো বোতামটা থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

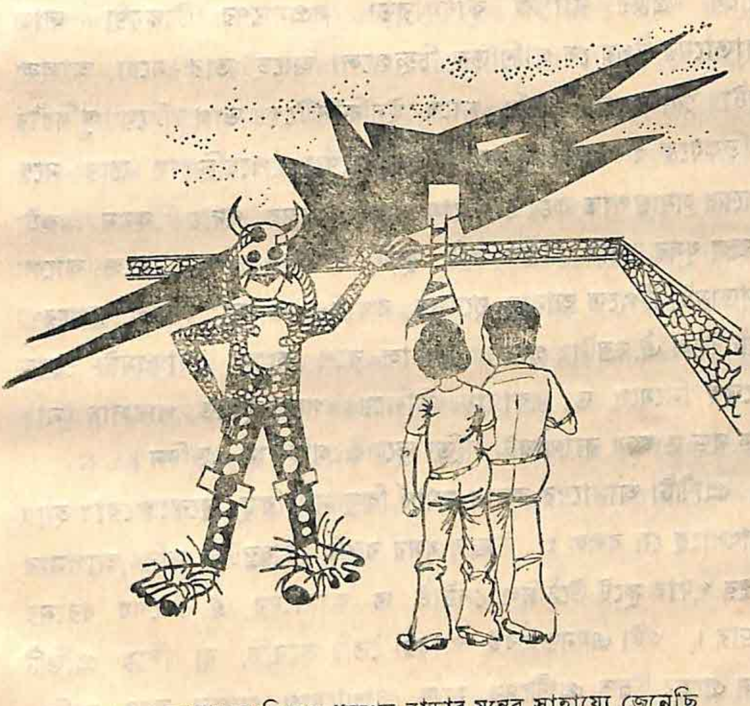
তন্ময় হয়ে আমি বিবর্তর নবতম বৈজ্ঞানিক অবদানের জগৎকে দেখছিলাম। আমার সেই দেখা এবং অনুভবের ঐকতান কিন্তু মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল যখন দেখলাম বিবর্ত সেন তার বাড়ির ছাদে বিকট এক জান্তব শব্দে চমকে উঠে ত্রস্তে ছুটে ছাদে চলে গেল এবং

যাবার সময় আমায় ডেকে গেল : আয় আমার সাথে—দেখবি দারুণ এক মজার ব্যাপার হয়েছে।

দারুণ এক কৌতূহল এবং অদ্ভুত এক মানসিক জড়তা নিয়ে গুটিগুটি পিছু নিলাম বিবর্তর। আর চমকে উঠলাম সামনের এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে।

দেখি কি, বিবর্ত সেন খুবই খুশমেজাজে অজানা এক ভিন গ্রহের প্রাণীর সাথে আমার দুর্বোধ্য গাণিতিক এক সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে চলেছে অনর্গলভাবে। পরে সেই কথোপকথনের মর্ম যা জেনেছিলাম তার কাছ থেকে তা এই রকম।

চমৎকার এক অদ্ভুত মহাকাশচারীর বর্মপরা অজানা ভিন গ্রহের



—আমরা আমাদের বিশেষ ধরণের রাডার যন্ত্রের সাহায্যে জেনেছি আপনার এই অপূর্ব টিভিফোন যন্ত্রের কর্মকৌশলের কথা।

সেই প্রাণীটি তার চমৎকার মহাকাশ যানটির পাশে দাঁড়িয়ে

বিবর্ত সেনকে অভিবাদন জানিয়ে বলছেঃ আমরা আমাদের বিশেষ ধরনের রাডার যন্ত্রের সাহায্যে জেনেছি আপনার এই অপূর্ব টিভিফোন যন্ত্রের কর্মকৌশলের কথা।

অবাক হয়ে বিবর্ত সেন জানাতে চাইল প্রাণীটির কাছেঃ সে কি! এটা কেমন করে সম্ভব হল?

প্রাণীটি সহজভাবে জবাব দিল: কেন, আপনি কি ভুলে গেছেন, দশমিক এক শতাব্দীর কোন এক দিনে আমাদের গ্রহের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন না?

বিবর্ত সেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে আমাকে সামনে পেয়ে একেবারে আবেগে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলঃ দেখেছিস সঞ্জয়, মাস তিনেক আগে যন্ত্রটির ব্যাপক কার্যকরিতা সপ্রমাণের উদ্দেশ্যে লাল বোতামের উপর যে গাণিতিক চিহ্নগুলো আছে তার মধ্যে আলফা বিটার যোগফলের বর্গের সাথে ইনফিনিটিকে ভাগ দিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষকে গুণ করে দূরত্বসূচক যে সংখ্যা পেয়েছিলাম তার সঙ্গে সময়ের সমানুপাত করে দেখলাম আমার যন্ত্রের পর্দায় কেমন একটা উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের যন্ত্রের ছবি ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে কালো বোতামটা টিপতে আমার দুর্বোধ্য কথার এক সাংকেতিক রূপরেখা ফুটে উঠল ঐ যন্ত্রটার গায়। খেয়াল বশে কালো বোতামটা ছেড়ে দিতেই নিমেষে তা কোথায় মিলিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এত বড় তাজ্জব ব্যাপারটা সত্যি ভুলেই গেছিলাম এতদিন।

প্রাণীটা আমাদের কথার মর্মার্থ কিছু না কিছু বুঝেছে বোধ হয়। সোৎসাহে সে বলল: উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের যে যন্ত্রটার ছবি আপনার যন্ত্রের পর্দায় ফুটে উঠেছিল সেটাই ত আমাদের ঐ বিশেষ ধরনের রাডার। ওটা এমনভাবেই আমরা তৈরি করেছি, যা দিয়ে প্রতিটি ভিন গ্রহের উন্নত প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকি। যন্ত্রটির এমন ক্ষমতাও আছে, তোমাদের রোবটের মত আমাদের হয়ে

তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। অবশ্য সে সব উত্তরই দেবে আমাদের গাণিতিক ভাষায়।

কৌতূহলী হয়ে বিবর্ত সেন জানতে চাইল: তোমাদের রাডার যন্ত্রে যে দুর্বোধ্য গাণিতিক চিহ্নগুলো সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম, তার অর্থ টা আমাদের পৃথিবীর ভাষায় করলে কি দাঁড়ায়?

প্রাণীটি উত্তর দিল: আমাদের যন্ত্রটি সেদিন তোমায় এই কথাই বলতে চেয়েছিল, আমাদের শুভেচ্ছা নাও বন্ধু। তোমার সাদর আমন্ত্রণ রইল আমাদের গ্রহে বেড়িয়ে যাওয়ার। তাছাড়া তোমাদের পৃথিবীর সভ্যতা যেখানে এখনও আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে, সেখানে তোমার এই টিভিফোন যন্ত্রের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। আগামী ব্রহ্মাণ্ডের বুকে যত উন্নত জীব আছে, তাদের মধ্যে এই যন্ত্রই একদিন এমন যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠবে, যাতে ভাষার দুর্বোধ্যতা বিলীন হয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। আমাদের যন্ত্রটি আরও তোমায় বলেছিল, আমাদের সেরা বিজ্ঞানী একদিন গিয়ে তোমায় আমাদের গ্রহের শুভেচ্ছা জানিয়ে আসবে তোমার এই স্মরণীয় অবদানের জন্য। আমিই সেই বিজ্ঞানী, এসেছি তোমায় আমার গ্রহের প্রাণভরা শুভেচ্ছা জানাতে। প্রাণীটি সাদরে তার দক্ষিণ হস্ত বাড়িয়ে বিবর্ত সেনের সঙ্গে করমর্দন করল সহাস্যে।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম দুই ভিন গ্রহের বাসিন্দার অকৃত্রিম হৃদয় বিনিময়ের দৃশ্য। এমন অপার্থিব মিলন আমি কোন কালেই দেখি নি।

সেদিনকার মত বিদায় নিলেও আজ আবার দুদিন বাদে বিবর্তর জরুরী তলবে তার বাড়িতে এসে হাজির হতে হল। ঘরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিবর্ত আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে

বলল ঃ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে সঞ্জয়। মহাকাশ যাত্রায় আমার সঙ্গী হতে হবে তোকে।

ভূত দেখার মতই চমকে উঠলাম বিবর্ত সেনের এই কথা শুনে ঃ সে কি রে! মহাকাশ যাত্রায় আমি তোর সঙ্গী হব? না না, এ সব তুই কি বলছিস পাগলের মত!

মুচকি হেসে বিবর্ত সেন নিজের মহাকাশ যাত্রার পোশাক পরতে পরতে বলল ঃ পাগল নই আমি সঞ্জয়। তুই ত জানিস, সেদিন অনামী নক্ষত্রলোক থেকে যে বৈজ্ঞানিক এসেছিল, তারই জরুরী আমন্ত্রণে আমাদের যেতে হবে সেখানে। সেখানে আমার এই টিভিফোনের প্রাকটিক্যাল ডেমনেস্ট্রশন দিতে হবে। তারা খুবই উৎসাহিত হয়েছে এই যন্ত্রের বাস্তব কার্যকরিতা দেখে। মাথার শিরস্ত্রাণের বোতামটা ঠিক করতে করতে বিবর্ত ফের বলল ঃ তবে এহ বাহ্য সঞ্জয়! নে নে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। চল, আমাদের পাখি রকেটে বসে আসল মজার ঘটনাটা বলব। দেখবি, আশ্চর্য না হয়ে তুই পারবি না।

আমি এক রকম বিমূঢ়চিত্তে যন্ত্রচালিতের মত চটপট সম্ভাভবের নির্দেশে মহাকাশচারীর অদ্ভুত পোশাকটি পরে নেহাৎই গোবেচারীর মত বিবর্তর সঙ্গে গিয়ে পাখি রকেটে বসলাম। ঠিক আমার সামনে সম্ভাভবে রকেটের ইঞ্জিনটি কব্জা করে বসল এবং পাশে বসল বিবর্ত সেন।

সম্ভাভবে মুহূর্তে স্টার্ট দিতে সাঁ করে এক রকম নিঃশব্দে আমাদের রকেটটি পৃথিবীর বায়ুস্তরের শেষ সীমায় এসে হাজির হল।

একটা জিনিস বিবর্তর দেখে সত্যিই আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না। মহাকাশ অভিযানের যে সব রকেটের কথা তোমরা বইতে পড়েছ, সেগুলো কেমন বৃহদাকার দেখতে এবং সেগুলোর উৎক্ষেপণের জন্য বিশেষ ধরনের স্টেশনের প্রয়োজন। আর তার উৎক্ষেপণের সময় যে বিকট বিশ্রী কানফাটানো আওয়াজ শোনা যায়, তার কোনটাই

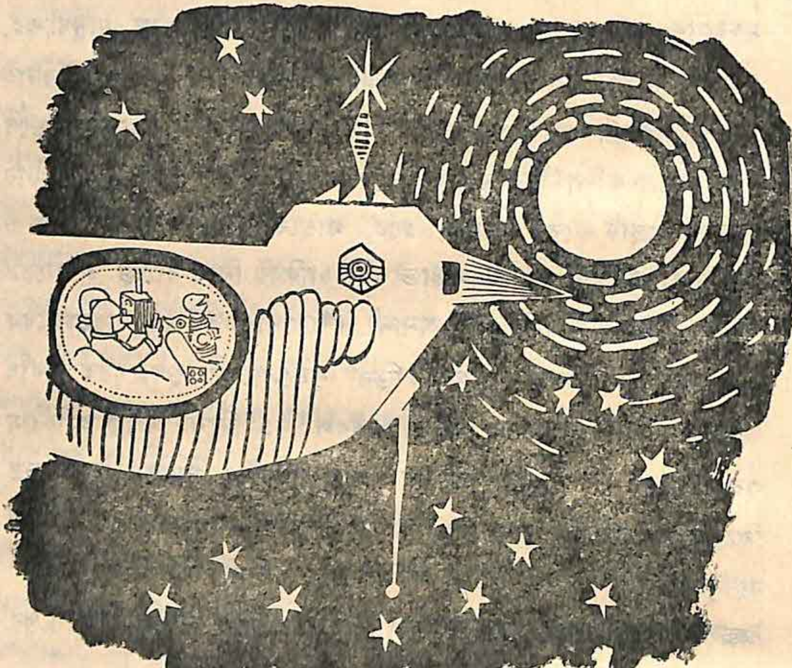
কিন্তু বিবর্তর এই চমৎকার পাখি রকেটে নেই। যেমন ছিমছাম এর গড়ন, তেমনি এর অবতরণ বা উৎক্ষেপণের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্টেশনেরও প্রয়োজন নেই। এবং এ যন্ত্রটা সবার অগোচরে নিঃশব্দে ওঠানামা করতে পারে।

মজাটা আরও বেশি অনুভব করলাম। যখন দেখলাম, তোমাদের মহাকাশ অভিযানের রকেটগুলো এখনো চালাতে হচ্ছে মানুষকেই, সেখানে কম্পিউটার কেবল সাহায্যকারী। কিন্তু ঠিক এর বিপরীতটাই দেখছি বিবর্তর এই রকেট যন্ত্রে। বিবর্তর সেরা আবিষ্কার সম্ভাভবে —যা নাকি কম্পিউটার তুল্য, তবে আমার মতে একে কম্পিউটার বলে খুব ছোট করেই দেখানো হবে, মানুষের থেকেও এর চিন্তা ও কর্মক্ষমতা ঢের বেশি, সেই সম্ভাভবেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই রকেটটাকে বিবর্তর সেই অনামী নক্ষত্রলোকের দিকে। সম্ভাভবের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তিন সূর্যলোকের সুদূর দূরত্ব অর্থাৎ কয়েকশ বছরের দূরত্বপথ আমরা কেবল দেড় দিনেই নাকি অতিক্রম করতে পারব। তাহলে বুঝতেই পারছ, পৃথিবীর সময়কে কত দ্রুত পিছনে ফেলে শব্দের চেয়ে বহুগুণ দ্রুতগতিতে আমাদের এই রকেটটি মহাশূন্যের বুক চিরে উড়ন্ত পাখির মত ভেসে ভেসে চলেছে নানা উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের আলোর বর্ণালী গায়ে মেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথের দিকে।

এই ফাঁকে একটি মজার ঘটনা তোমাদের বলে নি শোন। ঠিক যে সময় আমাদের পাখি রকেটটি আমাদের সৌরমণ্ডলের অধিপতিকে অতিক্রম করে অন্য সৌরজগতের রাজ্যে ঢুকতে যাবে, ঠিক তখনই বিবর্ত সেন আমার দিকে বিশেষ একধরনের টেলিদূরবীণ যন্ত্র এগিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : চটপট দেখে নে, আমাদের সূর্যের অপূর্ব মনোরম বর্ণচ্ছটা।

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম সে দৃশ্য। তোমরা ত জানই, পৃথিবী থেকে যে সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায়, তা কত অসম্পূর্ণ। কিন্তু

এখানে দেখলাম অবাধ বন্ধনহীন এক অপূর্ব সূর্যগ্রহণের দৃশ্য। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, এমন সূর্যগ্রহণের দৃশ্য মহাকাশের বুকে সয়ুজ-অ্যাপোলোর মিলনপর্বে মহাকাশচারীরা তোলবার চেষ্টা করেছিলেন।



—চটপট দেখে নে, আমাদের সূর্যের অপূর্ব মনোরম বর্ণচ্ছটা।

সব মিলিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের এই অনির্বচনীয় মহাজাগতিক রূপের মায়ায় আমি এমনভাবে তন্ময় হয়েছিলাম, যার ফলে এতক্ষণ ধরে বিবর্তর কোন কথাই আমার কানে ঢোকে নি। চমক ভাঙল তার কানফাটানো দরাজ হাসিতে: এরই মধ্যে তুই কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলি? আমার কোন কথাই যে তোর কানে ঢুকছে না দেখছি!

সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম: না রে, ভাবছিলাম, মানুষের

মাথার সব ব্রেন সেলগুলোই যদি সক্রিয় হত, তাহলে আজকে না জানি উন্নতির কোথায় গিয়ে পৌঁছত মানুষ—হয়ত সে নিজেও জানে না, তাই না বিবর্ত ?

মুচকি হেসে বিবর্ত বলল : তা যা বলেছিস। এই কথাই ত বলছিলাম তোকে এতক্ষণ ধরে। তা ত তুই কিছুই শুনলি না।

সস্থাভবে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে আমাদের সাবধান করে দিল : একটু ঠিক হয়ে সাবধানে বসবেন আপনারা। একটা ছুটন্ত নক্ষত্র আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তার আকর্ষণে বেশ একটু দোল খেয়ে উঠবে আমাদের রকেটটা। ভয়ের অবশ্য কোন কারণ নেই।

নিরুদ্বিগ্নভাবে বিবর্ত সেন বলল : আচ্ছা। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বলতে আরম্ভ করল : তা যা বলছিলাম শোন সঞ্জয়। ইংরেজিতে থট ওয়েভ বলে ত একটা কথা আছে জানিস। বাংলায় যাকে বলে চিন্তা তরঙ্গ।

: হ্যাঁ, সে ত জানি, তা কি হয়েছে ? এক রকম আনাড়ির মতই উত্তর দিলাম আমি।

আমাদের চিন্তা-ভাবনা যখন তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হয়, তখন অনায়াসে বলা চলে যে, এটা একটা শক্তিবিশেষ। এই বিশেষ ধরনের শক্তিকে তাহলে নিশ্চয় আমরা বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করতে পারি।

: সে কি ?

: আশ্চর্যের কিছু নেই এর মধ্যে সঞ্জয়। আচ্ছা, ধর, আমাদের বড় বড় রেস্টুরেন্টে এক সঙ্গে কতলোক বসে গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা-তামাসা করে। ভাব ত, সেই সময় কি ধরনের গুঞ্জন চলতে থাকে সেখানে। যদি এমন কোন যন্ত্র থাকে আমাদের যার দ্বারা সেই মাত্রাহীন শব্দ গুঞ্জনের তরঙ্গকে ধরে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়, তাহলে তা দিয়ে কিছু না হলেও সারাদিনে অন্তত দশ

থেকে কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। ব্যাপারটা একবার সেইভাবে ভেবে দেখত।

সোৎসাহে আমি বলে উঠলাম : তা তুই ঠিক বলেছিস বিবর্ত। আজকাল ত আমরা সৌরশক্তি নিয়ে দুঃসাধ্যভাবে মাথা ঘামাচ্ছি। অথচ আমাদের হাতের কাছে রয়েছে বিদ্যুতের এমন অজানা ভাণ্ডার।

: দুঃখের কথা তাহলে আর বলছি কি। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিবর্ত বলল : একথাটা কিন্তু তোদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের বোঝাতে পারলাম না। অথচ যে অনামী নক্ষত্রলোকে আমরা যাচ্ছি, সেখানকার বাসিন্দারা আমার এই প্রজেক্টের বহুমুখী সাফল্যের সম্ভাবনা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখেছে এবং তাই তাদের দেশের সেরা বিজ্ঞানীকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল টিভিফোন ছাড়া এই কর্মপ্রকল্পের প্র্যাকটিকাল ডেমনস্ট্রেশন তাদের দেশে গিয়ে আমায় দেখিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে তারা মহাকাশ থেকে নানা মূল্যবান ধাতব সম্পদ আহরণের সহজতম পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আমাদের শিখিয়ে দিতেও রাজি আছে।

: ও, তাই বুঝি আমরা সেখানে যাছি, তাদেরই বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ?

: তাই ত তোকে নিয়ে এলুম আমার সঙ্গে।

: সত্যি ভাই, তোর মত বন্ধুকে পাওয়া আমার সৌভাগ্যেরই ব্যাপার।

: বড় বেশি বাড়িয়ে বলছিস সঞ্জয়।

: না রে, তোর মত মনীষাকে আমরা ঠিক আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির সীমায় উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি নি। এটা আমি হলপ করেই বলতে পারি বিবর্ত, যদি আমরা তোকে ঠিকমত বুঝতে পারতুম, তাহলে হয়ত তোকে দিয়েই আমাদের বর্তমান শতাব্দীর আইনস্টাইন যা এগিয়ে দিয়ে গেছেন, তার থেকে অনেক-অনেক গুণ বেশি সামনে এগিয়ে যেতে পারত।

ঃ কি জানি সঞ্জয়, হয়ত তুই ঠিকই বলছিস।

ঃ না রে বিবর্ত, তোর হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সুপারম্যান এজ—অতিমানবের দিন এমনি করেই একদিন আসবে। হয়ত তারই সূচনা আজ আমরা এই মহাকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে এমনি-ভাবেই করে যাচ্ছি।

আকাশফাটানো অট্টহাসিতে একেবারে দরাজ হয়ে উঠল যেন বিবর্ত আমার এই কথা শুনে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সস্থাভবে ঘোষণা করল ঃ আপনাদের কোমরের বেল্ট ঠিকমত বেঁধে নিন। আমরা অনামী সেই নক্ষত্রলোকে এসে পৌঁছে গেছি। এখুনি আমাদের রকেট নক্ষত্রলোকের ভূমি স্পর্শ করবে।

পাঁচ

অনামী নক্ষত্রলোকের মহাকাশ বন্দরের মাটি স্পর্শ করতে না করতেই অপূর্ব মধুর এক সঙ্গীতের ঐকতান আমাদের কানে ভেসে এল। বিবর্ত আমার কাঁধটাকে ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে ঃ ওদের অভ্যর্থনাভবন থেকে আসছে এই মধুর সঙ্গীত। অবাক হোস্‌নে সঞ্জয়, ওরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

ঃ কই, কোন জনপ্রাণী দেখছি নে যে! টেরই বা পেল কি করে আমরা এসে পৌঁছেছি?

ঃ কেন, ওদের বিমান বন্দরে দেখছিস নে ঐ যে জ্বলছে উজ্জ্বল আলোকিত রাডার। আর ঐ ত ওদের অভ্যর্থনাভবন।

সামনে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম রামধনু রঙের আলোর জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে সুন্দর একটি মন্দিরোপম ভবন। ভবনটির শীর্ষদেশ আলোর সাতটি রঙে এমনভাবে অলংকৃত যা আমাদের দেশের সুন্দর আলপনার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি অবাক হয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে সুসজ্জিত ভবনটির এমন মায়াময় অপার্থিব রূপ দেখছিলাম।

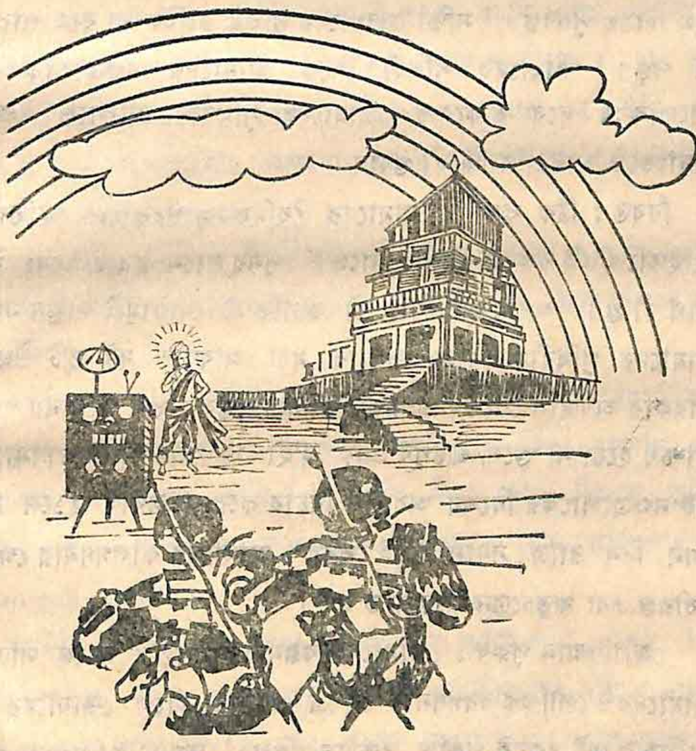
বিবর্ত বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বলল ঃ কি রে, আমাদের রূপকথার সেই স্বপনপুরী যেন, তাই না?

ঃ তা যা বলেছিস। আমাদের কল্পনায় ভাষার লাগামে যতটা বেড় পাওয়া যায়, তাই দিয়েই আমরা রূপকথার স্বপনপুরীর মায়াময় রূপ আমাদের মনের মধ্যে আঁকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ যে দেখছি তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। চর্মচক্ষে ভবনের এমন অপূর্ব কারুকৃতি দেখব, তা যে ভাই স্বপ্নেরও অতীত।

ঃ তুই ঠিক বলেছিস। তবে এটাই কিন্তু এদের কাছে পুরোপুরি

বাস্তব। যাক গে, ঐ দেখ ওরা আসছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে।

আমার মনের ঘোর কাটতে না কাটতেই শুরু হল চোখের ঘোর। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দিব্য জ্যোতিষ্মান এক পুরুষ। অপূর্ব তার বেশবাস, অপূর্ব তার কেশবিন্যাস। জ্যোতিষ্মান পুরুষটি একটি অদ্ভুত ধরনের কমপিউটর নিয়ে কথা বলছে বিবর্তর সঙ্গে। উভয়ের ভাব বিনিময়ের ভাষা আমার দুর্বোধ্য কিছু গাণিতিক চিহ্নসমূহ। পরে বিবর্ত তার যা অর্থ বলেছিল তা এই রকম ঃ



—হে মর্তলোকের দুই আগন্তক···আমাদের প্রাণের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

জ্যোতিষ্মান পুরুষ ঃ হে মর্তলোকের দুই আগন্তক, আমাদের

ইউ নক্ষত্রলোকের আমন্ত্রণে তোমাদের সৌরপৃথিবীর অনন্তপথ পেরিয়ে ৩২ আলোকবর্ষ দূরে আমাদের সৌর পৃথিবীতে তোমাদের এই শুভ উপস্থিতিতে আমরা সত্যিই আনন্দিত এবং অভিভূত। আমাদের প্রাণের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

বিবর্ত: আমাদের সৌরলোকের সঙ্গে তোমাদের সৌরলোকের এই শুভ যোগাযোগে আমরাও কম আনন্দিত নয় বন্ধু। আমার টিভিফোনের দৌলতে তোমাদের সাথে এই যে প্রথম যোগাযোগ গড়ে উঠল, তা যেন চিরস্থায়ী হয় বন্ধু।

জ্যোতিষ্মান পুরুষ: তোমরা ত আমাদের ইউ নক্ষত্রলোকের নাম দিয়েছ পুনর্বসু। সত্যি তোমাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি নে বন্ধু। তোমাদের পৃথিবী থেকে আমাদের নক্ষত্রলোক ৩২ আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও তোমাদের পৃথিবীর আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমরা থাকি দীপ্তিমান।

বিবর্ত: ঠিক কথা। আমাদের বৈদিক যুগেরকালে তৈত্তিরীয় সংহিতাতে এই রকমই ব্যাখ্যা আছে। পুনর্ মানে দুবার এবং বসু অর্থে দীপ্তি। অর্থাৎ দুটি দীপ্তি বা জ্যোতি। মোটামুটি ফাল্গুন মাসে আমাদের পৃথিবীর নির্মেঘ সন্ধ্যার মধ্য আকাশে দৃষ্ট দুটি উজ্জ্বল তারকার অবস্থান থেকেই এইরকম কল্পনার উদ্ভব। শুধু তাই নয় বন্ধু! আশ্চর্য হয়ো না শুনে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ছ'হাজার বছর আগে তোমাদের এই নক্ষত্রলোকের বিশেষ অবস্থান বিচার করে (অর্থাৎ ২১শে মার্চ যখন দিন রাত্রি সমান, সেই সময়) আমাদের কালগণনার ক্ষেত্রে বর্ষারম্ভ এবং ঋতুচক্রের সূত্রপাত হত।

জ্যোতিষ্মান পুরুষ: তোমাদের কল্পনার বাহাদুরি আছে সত্যি। আমাদেরও লৌকিক বর্ষগণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন কালে তোমাদের মত খানিকটা এই রকমই পদ্ধতি বর্তমান ছিল। তখন আমাদের মর্ত-লোকের আকাশে দৃশ্যমান তোমাদের সৌরলোকের নাক্ষত্রিক পরিচয় নির্দিষ্ট হয়ে ছিল আমাদের গাণিতিক পরিভাষা অনুসারে।

বিবর্ত ঃ কি সেই পরিচয় ?

জ্যোতিষ্মান পুরুষ ঃ সে ত তোমরা জানই, তোমাদের ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় সৌরলোক।

বিবর্ত ঃ অর্থাৎ কিনা, নিত্য চলমান গোল চাকতির মত আকাশ-গঙ্গা (milk-way) ছায়াপথ নামক যে বিশ্বের আমরা বাসিন্দা, তার কথাই ত বলছ।

জ্যোতিষ্মান পুরুষ ঃ ঠিক ঠিক। তোমাদের সৌর আকাশে আমাদের যে বিশ্বকে তোমরা দেখতে পাও, তাকে যেমন আমরা বলে থাকি আকাশ জ্যোতিধারা ছায়াপথ।

বিবর্ত ঃ আমাদের পৃথিবী থেকে এ পর্যন্ত এমনি প্রায় দশকোটি বিশ্বের ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে আমাদের ধারণায় এই দশকোটি বিশ্ব নিয়ে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি হলেও আমরা মনে করি এই মহাবিশ্বে আরও অনেক অজানা বিশ্বের ছায়াপথ আছে যা এখনও আমাদের দৃষ্টির অগোচর।

জ্যোতিষ্মান পুরুষ ঃ ঠিকই বলেছ। তবে আমরা এ পর্যন্ত প্রায় বিশকোটি বিশ্বের ছায়াপথের সন্ধান পেয়েছি, যা তোমরা এখনও পাও নি।

আমি মুগ্ধ হয়ে দুজনের গাণিতিক পরিভাষায় এই মহাবিশ্বের মহাশূন্যের রহস্য-কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, নিত্য চলমান এই মহাবিশ্বে আমরা শুধু চলছি আর চলছি দিক থেকে দিগন্তে সুদূর অতীত থেকে দূরতম ভবিষ্যতের পানে। প্রাণের এমন রূপকথার ত তুলনা নেই দেখছি।

আমার এই তন্ময়তার ঘোর কতক্ষণ ছিল জানি না। যখন এই ঘোর কাটল, তখন দেখি আমি অপূর্ব বর্ণালীধারায় সজ্জিত ওদের সেই অতিথিভবনের মধ্যে বিবর্তর পাশে চমৎকার রাজকীয় ভঙ্গীতে বসে আছি। দেখলাম বিবর্ত সেখানে সমাগত কৌতূহলী জ্যোতিষ্মান প্রাণীদের সামনে গাণিতিক পরিভাষায় তার অপূর্ব আবিষ্কার

টিভিফোনের যান্ত্রিক কুশলতা তথা তার বাস্তব উপযোগিতার কথা অনর্গল ভাবে বলে চলেছে। তার সেই ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে ওদের নিজস্ব ভাষায় অনূদিত হয়ে গোটা হলকে এক দুর্বোধ্য অথচ শ্রুতি-সুখকর সুন্দর শাব্দিক পরিবেশে ভরিয়ে তুলছে। বিবর্তর এই যন্ত্র-সম্পর্কিত তথ্যাদি তারা দেখলাম নানা গাণিতিক কুশলতায় বারবার যাচাই করে নিচ্ছে। আর যখনই বিবর্তর তথ্যাদির সত্যতা সপ্রমাণিত হচ্ছে, তখনই দেখছি, তাদের সে কি উল্লাস! এমন মনোরম উল্লসিত অভিনন্দনের বর্ণনা আমার সীমাবদ্ধ ভাষায় দেয়া সম্ভব নয়; কেবল কল্পনার স্বপ্নেই এটা নেয়া যেতে পারে।

ওদের নক্ষত্রলোকের সময়ের হিসেবে আমরা সেখানে পাঁচদিন ছিলাম। এবং এই পাঁচদিনই আমরা কাটিয়েছিলাম ওদের দেশে রাজকীয় আতিথ্যের মর্যাদায়।

দ্বিতীয় দিন ওদের অতিথি ভবনে যথানির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম গিয়ে যখন, তখন সত্যিই আমার অবাক হবার পালা শুরু হল। অতিথিভবনে ঢুকতেই বিবর্ত বলল: চেয়ে দেখ, আজ এখানে মহাবিশ্বের নানান বিশ্বলোকের প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছে।

: তাই ত দেখছি। ব্যাপারটা কি বল দেখি? বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম বিবর্তকে।

: আমার এই টিভিফোন মহাবিশ্বে যত বিশ্বলোক আছে তাদের মধ্যে মহান মৈত্রীর যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে পারে কিনা, তারই উপযোগিতা যাচাই করে দেখতে ওরা এসেছে এই বিশ্বলোকের বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে।

: সত্যি তুই অবাক করলি আমায়। আমি যে তোকে কি বলে আমার মনের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাব তা ভেবেই পাচ্ছি না।

: কেন রে, কি হল আবার?

: সত্যি বিবর্ত তুই জানিস না আমাদের পৃথিবীলোকের সম্মানকে

আজ তুই মহাজাগতিক আন্তর্বিশ্বের মাঝে কত উঁচুতে তুলে দিলি তোর এই টিভিফোনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

: রাখ তোর প্রশংসা। ঐ দেখ, অতিথি আসনের সামনের সারিতে মধ্যখানে বসেছে কৃত্তিকা, রোহিণী, আর্দ্রা নক্ষত্রলোকের বাসিন্দারা।

: তাই বুঝি? আমাদের আকাশে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যেবেলায় এইসব তারকাপুঞ্জকেই ত দেখা যায়।

: হ্যাঁ, কৃত্তিকা নক্ষত্রলোক আমাদের পৃথিবী থেকে ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। রোহিণী ৫৩ আলোকবর্ষ এবং আর্দ্রা ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। আর ঐ যে, মধ্যের সারিতে ঠিক মাঝখানে বসে আছে ৭১ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত স্বাতী নক্ষত্রলোকের প্রবাল বর্ণের পোশাক পরিহিত বাসিন্দাটি। আর ঠিক তার ডান দিকে পাশে বসে আছে ১২০ আলোকবর্ষ দূরের চিত্রা নক্ষত্রলোকের বাসিন্দাটি। একে বেশ চটপটে বলেই মনে হচ্ছে।

: কিন্তু অতিথি আসনের পিছনের সারিতে বেশ দক্ষিণ ঘেঁষে একই ধরনের উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণের পোশাক পরে যে তিনজন নিজেদের মধ্যে বেশ গল্পগুজব করছে, ওরা কারা? কোত্থেকে এসেছে?

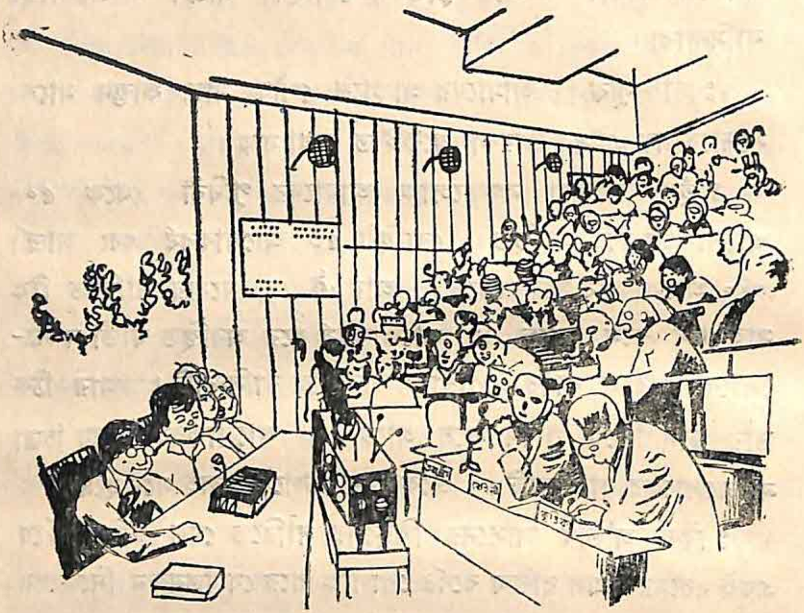
: ওরা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা। এই নক্ষত্রলোক ২৫০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

এমনিভাবে আমাদের কথোপকথন যখন চলছিল, ঠিক তখনই অতিথিভবনে একটি বিশেষ সুর বেজে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জনক্ষুব্ধ সরব হলটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বিবর্ত বলল: অধিবেশন শুরুর আবেদন প্রচারিত হল ওদের ভাষায়। চল্, আমরা গিয়ে বসি আমাদের আসনে।

বিবর্ত তার আসনে বসতে না বসতেই তার সামনের কমপিউটর বলে উঠল: আপনার টিভিফোনের বাস্তব উপযোগিতা দেখতে নানান নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা আজ এখানে সমাগত। আপনি

দেখান আপনার যন্ত্রের কার্যকুশলতা। আমরা বড়ই আশাবাদী হয়ে উঠেছি, ভবিষ্যতে এই যন্ত্রই হয় ত আমাদের ভাবনাচিন্তার পারস্পরিক আদানপ্রদান ঘটাতে সমর্থ হবে আন্তর্মহাবিশ্বে।



—আপনার টিভিফোনের বাস্তব উপযোগিতা দেখতে নানান নক্ষত্র লোকের বাসিন্দা আজ এখানে সমাগত। আপনি দেখোন আপনার যন্ত্রের কার্যকুশলতা।

বিবর্ত নিখুঁতভাবে একের পর এক তার যন্ত্রের কর্মকুশলতা তত্ত্বতথ্য দিয়ে আন্তর্মহাবিশ্বের সমাগত অতিথিদের সামনে ব্যাখ্যা করল এবং হাতে কলমে তা প্রমাণও করে দেখাল।

সমাগত অতিথিরা নির্বাক বিস্ময়ে তার যন্ত্রের অপূর্ব কর্মকুশলতা প্রত্যক্ষ করল। বিপুল অভিনন্দনের সাড়া পড়ে গেল গোটা হল জুড়ে। বিবর্তর অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক মনীষার জয় ঘোষিত হল এইভাবে।

কিন্তু তাজ্জব ঘটনা ঘটল ঠিক তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলায়।

আমরা ব্যস্ত ছিলাম পুনর্বসু নক্ষত্রলোকে নানা অভ্যর্থনা-সম্মেলন নিয়ে। আর ঠিক সেই সময় সম্ভাভবে আপন স্বাধীন খুশিমত এখানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। এদের জীবনযাত্রার নানান অন্দিসন্ধিও জেনেছে এরমধ্যে।

সেদিন হয়েছে কি, ওদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে আমাদের ছিল আমন্ত্রণ রক্ষার পালা। বিবর্ত আর আমি সারা সকাল তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ওদের স্থানীয় সময় সন্ধ্যে প্রায় ছটা নাগাদ যখন আমরা তৈরি হয়ে বেরোতে যাব, ঠিক তখনই সম্ভাভবে কোথা থেকে একেবারে তেড়ে ফুঁড়ে এসে আমাদের যাত্রার পথরোধ করে দাঁড়াল। আমাদের কিছু জিজ্ঞাসার সুযোগ না দিয়েই ও একরকম ধমকের সুরে বলতে শুরু করল ঃ ওদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে কেন আর তোমরা যাচ্ছ ? যারা চোর, তাদের অতিথি হয়ে থেকে আমাদের লাভ কি ?

ঃ সর্বনাশ ! বিবর্ত আপন মনেই স্বগতোক্তি করল ঃ কি বলছিস্ কি তুই পাগলের মত ?

ঃ পাগল আমি নই দাদা, পাগল ত দেখছি তোমরাই। তা না হলে—

বিবর্ত কেমন যেন টলতে টলতে নিজের বিছানায় বসে পড়ল। আর হাঁপাতে হাঁপাতে কি যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আমারও অবস্থা প্রায় তথৈবচ। তবু নিজেকে খানিকটা সামলে সম্ভাভবেকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ভনিতা রেখে এখন বল ব্যাপারটা কি ?

এতক্ষণে সম্ভাভবের উত্তেজনাটা যেন একটু কমে এসেছে। স্বাভাবিক ভাবে সে বলল ঃ তোমরা জানই ত, প্রতিদিন দুপুরে আমি পৃথিবীতে তোমার টিভিফোনের গ্রাহক কেন্দ্রে এখানকার খবরাখবর পাঠাই। ওখানকার গ্রাহক কেন্দ্রের দায়িত্ব ত তুমি দিয়ে এসেছ সসেমিরা এবং চ্যাঙ্‌ফোর ওপর। তা আজ দুপুরে তোমরা যখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছিলে, সেই সময় আমি প্রতিদিনকার মত

পৃথিবীতে খবর পাঠান নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আর ঠিক সেই অবসরে দেখি কি, অদ্ভুত একটা ছায়ামূর্তি তোমাদের ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পাশের এই সিঁড়ি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তা টেরই পেলুম না। মনটায় কেমন যেন একটা কু ডেকে উঠল। কি মনে করে চটপট উঠে এসে তোমাদের ঘরে ঢুকেই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। সর্বনাশ হয়েছে!

ঃ আরে ছাই, বল না দেখি, কি সর্বনাশ হয়েছে? বিবর্ত ধৈর্যহারা হয়ে জানতে চাইল।

ঃ তোমার টিভিফোন তত্ত্বের পাণ্ডুলিপিটা কোথায় দেখত?

বিবর্ত এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল। বিস্মিত হয়ে সম্ভাভবেকে জিজ্ঞেস করল ঃ কেন, ওটা তোর যে ব্যাগের মধ্যে ছিল!

ঃ সে ত জানি ছিল। ঐ দেখ, ব্যাগটা যেখানে ছিল, সেই খানেই মুখখোলা অবস্থাতেই ওটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু ওর ভিতর দেখ, কোন পাণ্ডুলিপিরই নামগন্ধ নেই।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঘরের যেখানে ব্যাগটা ছিল, সেখানে গিয়ে ভাল করে দেখলাম, সত্যিই ত, ওর মধ্যে কোন কাগজ-পত্রেরই নামগন্ধ নেই? গেল কোথায় ওটা?

সম্ভাভবে বলল ঃ যাবে আর কোথায়, ঐ অদৃশ্য অথচ ক্ষণিকের দৃশ্যমান ছায়ামূর্তিটিই ওটা চুরি করে উধাও হয়েছে। তোমরা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলে।

ঃ আশ্চর্য ত! দুজনেই আমরা একসঙ্গে স্বগতোক্তি করে উঠলাম। আমি বিবর্তর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এখন তা হলে উপায়? কি করে ওটা উদ্ধার করা যাবে?

বিবর্ত যেন কি ভাবছিল। খানিকটা অন্যমনস্কের সুরে আপন মনেই বলে উঠল ঃ চোর দেখছি এখানেও বহাল তবিয়তে আছে!

সম্ভাভবে আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগল ঃ না না, এখানে

আর একমুহূর্তও নয়। চল, আমরা এখুনিই আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাই।

আমি খানিকটা সান্ত্বনার সুরে সম্ভাভবেকে বললাম: অধৈর্য হয়ে লাভ কি। মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার না করে ত আর এখান থেকে যাওয়া যাবে না।

আমার কথাটায় যেন বিবর্ত পথের নিশান খুঁজে পেল। তাড়াতাড়ি সে উঠে ঘরে পশ্চিমদিকে যে কসমিক টেলিফোন যন্ত্রটা রয়েছে, সেদিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চটপট যন্ত্রটায় নির্দিষ্ট বোতাম টিপে এখানকার বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতিকে দ্রুত এখানে চলে আসতে জরুরী অনুরোধ জানান হল।

কাজ হল তাতেই। মুহূর্ত মধ্যেই সভাপতি ড. এক্স. এম. আমাদের বিশ্রাম ভবনে এসে হাজির হলেন হন্তদন্ত হয়ে। জানতে চাইলেন, ব্যাপার কি? কিসের জন্য এমন জরুরী তলব।

বিবর্ত ধীরে ধীরে ঘটনাটা তাঁকে জানাল। তিনি শুনে স্তম্ভিত হলেও বললেন: জানতাম, এমনটি ঘটবে এবং আমাদের আগেই এরজন্যে সাবধান হওয়ার দরকার ছিল। এরজন্যে সত্যিই দুঃখিত মিঃ বিবর্ত সেন। উচিত ছিল এরজন্যে আপনাদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তবে কি জানেন, আমাদের এই বিশ্বলোকে এমনটি এর আগে কখনও ঘটে নি। কিংবা এই জিনিস যে ঘটতে পারে তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না। সেজন্যেই বোধ করি, আমাদের একটু হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। যাকগে, ওর জন্যে আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। আপনার জিনিস আমরা উদ্ধার অবশ্যই করে দেব এবং এখুনিই এর ব্যবস্থা করছি।

ড. এক্স. এম. যেমনভাবে এসেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময় করে বিদায় নিলেন।

ওদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে আমাদের পৌঁছবার সময় উত্তীর্ণ প্রায়। আমি ওখানে যথাসময়ে উপস্থিত হবার অভিপ্রায় বিবর্তকে জানাতে সেও রাজি হয়ে উঠে দাঁড়াল : চল, আর দেরি করে লাভ নেই।

আমিও বিবর্তর কথায় সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম : ঠিকই। ড. এক্স. এমের প্রতিশ্রুতিতে অবশ্যই আমরা নির্ভর করতে পারি। তুই কি বলিস সম্ভাভবে ?

নিরাসক্ত গলায় সম্ভাভবে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল : তা বাপু, তোমরা যা ভাল বোঝ কর।

বুঝলাম, সম্ভাভবে পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না যেন ড. এক্স. এমের কথার উপর। কিন্তু এই সুদূর বিদেশে এছাড়া আর উপায়ই বা কি ? বিবর্তরও মত তাই।

দারুণ এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা গেলাম ওদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র দেখতে। এখানে আমরা অভ্যর্থনাও পেলাম যথারীতি। ড. এক্স. এমই এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

আর এখানেই পূর্বোক্ত দুর্ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হল সহসা।

সত্যি, এদের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র দেখবার মত বটে। যেন রূপকথার রাজ্য। বিবর্ত বলল : কিরে সঞ্জয়, আশ্চর্য হয়ে গেলি নাকি ? আমাদের পৃথিবীলোকে এমন গবেষণাকেন্দ্রের কথা আজও চিন্তা করতে পারে নি, কি বল ?

আমি একটু ঠাট্টা ছুঁড়ে দিলাম বিবর্তকে পরীক্ষা করতে : তা বটে। তবে আমাদের বিবর্ত সেনই বা কম যায় কিসে এদের থেকে।

: সব কিছুতেই তোর দেখছি ঠাট্টা। অসহিষ্ণু হয়ে বিবর্ত একটু বিরক্ত প্রকাশ করল যেন।

বুঝলাম, ভিতরে ভিতরে বিবর্ত বেশ ক্ষুব্ধই হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গটা তাই একটু ঘুরিয়ে দিলাম : এটা ঠাট্টার কথা নয় বিবর্ত। তোর উন্নতমানের পাখি রকেট বা টিভিফোন ছিল বলেই না, আমাদের জন্মজন্মান্তরের স্বপ্ন-কল্পনা আজ এমন বাস্তবে পরিণত হতে পেরেছে।

: কি রকম ?

আজ যদি তোর টিভিফোন না থাকত, তাহলে কি শুধু পাখি-রকেটে চড়ে আমাদের এই সুদূর নক্ষত্রলোকে আসার কোন প্রশ্নই উঠত ? কিংবা আমাদের মরজীবনে এই নক্ষত্রলোকে আসার বিচিত্র অভিজ্ঞতাও কি ঘটত ? তা যাকগে, চল ঘুরে ঘুরে দেখি ওদের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে।

আমাদের সঙ্গে গাইড যিনি ছিলেন, তিনি অতি যত্নে ধীরে ধীরে গাণিতিক পরিভাষার সাহায্যে দ্রষ্টব্য প্রতিটি যন্ত্রের নাম, তার ব্যবহার ইত্যাদি খুব সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে বিবর্ত নেড়েচেড়ে সেগুলির কিছু কিছু পরীক্ষাও করে দেখছিল। দেখতে দেখতে এক সময় বিবর্ত আমাকে গভীর আবেগে বলে উঠল : বুঝলি সঞ্জয়, এদের এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো দেখে বারবার আমার একটা কথাই শুধু কি মনে হচ্ছে জানিস ? মনে হচ্ছে, এরা গণিতবিদ্যায় উন্নতির চরমশিখরে উঠেছে বলেই এমন উন্নততর বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচয় এই আবিষ্কারগুলোর মধ্যে দিতে পেরেছে।

আমি এমন ঠাট্টার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। হাসতে হাসতে বললাম : তা ঠিক। তবে, আমাদের বিবর্ত সেনের গাণিতিক মনীষার উপরেও কি এরা যেতে পেরেছে ?

: নাঃ, তোর সব তাতেই ঠাট্টা। কিন্তু ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, তোদের ত কেবল একটাই বিবর্ত সেন আছে। আর এদের দেখছিস্, এখানে যে শত শত বিবর্ত সেন আছে।

: আমাদেরও হবে। একরকম মুখ ফস্‌কেই বেরিয়ে এল কথাটা।

: তা বেশ।

আমরা যখন এরকম হালকা কথার খুশির হাওয়ায় ভাসছিলাম, ঠিক তখনই ওদের কমপিউটরের মাধ্যমে জানতে পারলাম, পাশের ঘরে ড. এক্স. এম. আমাদের একবার এখুনিই ডেকে পাঠিয়েছেন।

গাইডের সঙ্গে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই অকুস্থলে এসে হাজির হলাম। বিবর্তকে দেখে ড. এক্স. এম. হাসিমুখে তাকে জানালেন: আপনার হারানো দলিল উদ্ধার করা গেছে। এই বলে তিনি একরকম বিবর্তকে হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে এনে যে দৃশ্য দেখালেন, তাতে আমরা দুজনেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম।

: সে কি! চ্যাঙ্‌কো তুই? পরম বিস্ময়ে দুজনেই একসঙ্গে যেন আঁৎকে উঠলাম।

ভেউ ভেউ করে বন্দী চ্যাঙ্‌কো কেঁদে উঠল: না, দাদাবাবু, আমার কোন দোষ নেই। তোমরা চলে আসবার পর ইল্বল নক্ষত্রলোক থেকে আমার কাছে প্রস্তাব যায় ওদের নক্ষত্রলোক পরিদর্শনে আমায় যেতে হবে। অগস্ত্য নক্ষত্রলোকের সঙ্গে ওদের যে চিরকালের বিবাদের কাহিনী তোমাদের নানা পুরাণে কথিত আছে, সেই বিবাদে ওদের জয়ের জন্য তোমার বৈজ্ঞানিক মনীষাকে ওরা কাজে লাগাতে চায়। সেজন্য নানাভাবে ওরা আমায় প্রলুব্ধ করে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, এতে আমার বিন্দুমাত্র দোষ নাই।

মুহূর্তে আমার স্মৃতিপটে অগস্ত্য-ইল্বলের পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যুচ্চমকের মত ভেসে উঠল।

মহাভারতে আছে, মণিমতীপুরে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করত। সে একবার তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের কাছে দেবতুল্য পুত্র প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার প্রার্থনা পূরণ করতে অরাজী হওয়ায় সে ব্রাহ্মণকুলকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করল। এ

ব্যাপারে সে তার সহোদর বাতাপিকে কাজে লাগিয়েছিল। বাতাপি ছাগরূপ ধারণ করতে পারত। ইল্বল সেই বাতাপিরূপী ছাগকে ব্যঞ্জন রেঁধে তার বাড়িতে আসা নিমন্ত্রিত অতিথি ব্রাহ্মণদের সাদরে ভোজন করাত। তারপর মায়াবলে সেই মৃত ছাগকে জীবিত করে ব্রাহ্মণের উদর থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানাত। বাতাপী অতিথি ব্রাহ্মণদের উদর বিদীর্ণ করে সহাস্যে বেরিয়ে আসত। এইভাবে ইল্বল ব্রাহ্মণকুল ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে ব্রাহ্মণদের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য একদিন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বলে ইল্বল বাতাপির এই দুষ্কর্ম স্তব্ধ করে দেন।

বিবর্ত আমায় বলেছিল, এইসব পৌরাণিক কাহিনী নিছক কাহিনী নয়। মহাকাশ ভিত্তিক নক্ষত্রমণ্ডলের পটভূমিতে এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এইসব পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।

মহাকাশে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুবের আকাশে যে ছায়াপথ দৃশ্যমান, তারই পার্শ্বভাগে দক্ষিণ দিকে অগস্ত্য নক্ষত্রের অবস্থান। এই নক্ষত্র আমাদের, পৃথিবী থেকে ১০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় দুহাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল। আর পুরুষের যোদ্ধার বেশে মহাকাশে অনেকগুলো তারকা নিয়ে যে নক্ষত্রটির কল্পনা গড়ে উঠেছে তাকেই আমরা কালপুরুষ বলি। সংস্কৃতে এর নাম মৃগনক্ষত্র। কারণ কালপুরুষ নক্ষত্রের কয়েকটি তারকা নিয়ে মৃগশিরা নক্ষত্রের কল্পনা। এই মৃগশিরার শিরোদেশে যে পাঁচটি তারকা আছে তাকেই আমরা বলি ইল্বল। এরা কালপুরুষের কটিদেশে অবস্থিত। আবার কালপুরুষ নক্ষত্র বাতাপি হিসেবে পরিচিত। আমাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, মৃগ হিসেবে কাল-পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে। ওই মৃগনক্ষত্র ঋশ্য নামের একটি ছাগ।

জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা দেখি, অগস্ত্য ঋতু-নির্দেশক তারা। এর উদরে বর্ষা, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়ের অবসান অর্থাৎ

বাতাপির মৃত্যু ঘটল। বাত কথাটি থেকে বাতাপি কথাটি এসেছে। বাত কথার অর্থ ঘূর্ণিঝড়। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে।

ঃ দোষ নেই মানে, কি বলতে চাস্ তুই ? ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল বিবর্ত। বিবর্তর এমন কণ্ঠস্বর আমি শুনি নি কোন দিন। তার এই উত্তেজিত স্বর আমার কানে যেতেই আমার এতক্ষণের চিন্তার ধারা যেন কেটে গেল।

ঃ বিশ্বাস কর দাদা, তোমার দলিল যদিও আমি চুরি করেছি, কিন্তু এখনো আমি ওদের হাতে দিই নি। ওরা যেভাবে আমায় প্রলুব্ধ করে এখানে নিয়ে এসেছে, তাতে দেখছি সত্যিই তোমার ক্ষতি হবে। তাই এখন আমার সঙ্গে শুরু হয়েছে মতান্তর। চ্যাঙ্‌ক্রো কাঁদতে কাঁদতে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল।

ঃ মানে, তোর হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বল, কি ব্যাপার।

ঃ প্রথমে ওরা বলেছিল, আমাকে পেতে চায় ওদের অগস্ত্য-লোকের সঙ্গে যুদ্ধের দোসর হিসাবে। বিশ্বাস কর দাদা, বিনা কাজে অলস হয়ে বসে থেকে থেকে তোমাদের পৃথিবীলোকের উপর আমার একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে। তাই সত্যিকারের বীরত্ব দেখাবার জন্য ওরা যেভাবে প্রলুব্ধ করেছিল, তাতে আমি রাজি না হয়ে পারি নি। কিন্তু ওদের বিশ্বলোকে যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন ওরা আমায় এখানকার আন্তর্মহাজাগতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ওদের সহযাত্রী হতে অনুরোধ করল। আমিও সরল বিশ্বাসে ওদের এই প্রস্তাবে রাজিও হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, এখানে এসে আমি তোমার সাথে হঠাৎ দেখা করে একরকম তোমায় চমকে দিতে পারব। সেইমত এখানে আসার তৃতীয় দিনে ওরা বলল, চল তোমার বিবর্ত সেনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে আসা যাক। ওরা যে এইভাবে আমার চোখে ধুলো দেবে, তা আদপেই ভাবতে পারি নি। এক রকম বোকাই বানিয়ে আমাকে দিয়ে ওরা তোমার এই দলিলটা চুরি করিয়েছে। চুপি চুপি তোমার ঘরে আমরা যখন অশরীরী হয়ে

ঢুকেছি, তখন ওরা আমায় বলল তোমার এই দলিলটার কথা। একবার চোখের দেখা দেখবে নাকি। আমি ত জানি তুমি এটা কোথায় রাখতে পার। তাই সরলমনে যখন ওটা বের করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের দলের নেতা আমার হাত থেকে একরকম ছোঁ মেরেই ওটা ছিনিয়ে নিল এবং চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। মুহূর্তে আমি ত অবাক। তারপরেই বুঝলাম, ওদের উদ্দেশ্যটা কি। সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করে ফেললাম, কি আমায় করতে হবে এবং কেমন করেই বা তোমার এই মূল্যবান দলিলটা ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে।

তুমি ত জানই, আমার বুদ্ধিমত্তার কথা এবং যেমনটি ভাবা, তেমনটিই আমার কাজ।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমার অপরা জিনবিদ্যার গুণে এই পুনর্বসু নক্ষলোকের দশদিক বন্ধন করে নানারূপে ওদের পিছু নিয়ে শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ওদের গোপন সিন্ধুক থেকে দলিলটা এই কিছুক্ষণ আগেই ড. এক্স. এমের কাছে এনে জমা দিয়ে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়। ওঁর কাছে শুনলাম, তুমি আসবে এখানে।

চ্যাঙফোর কথা শেষ হতে না হতেই ড. এক্স. এম. বারবার এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন বিবর্তকে ঃ আপনার আর কোন চিন্তার কারণ নেই। ইব্বল নক্ষত্রলোকের অতিথিদের আমরা আমাদের নক্ষত্রলোক থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। সত্যি আমরা এই কাজের জন্যে দুঃখিত।

ড. এক্স. এমের কথা শেষ হয়েছে কি হয় নি, অমনি দেখি ঝড়ের মত সস্থাভবে এখানে এসে হাজির! হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলতে শুরু করল বিবর্তকে ঃ পেয়েছি দাদা, আপনার দলিলের সন্ধান পেয়েছি। সসেমিরা এইমাত্র আমায় টিভিফোন মারফৎ জানাল, ইব্বল নক্ষত্রলোকের বাসিন্দারা চ্যাঙফোকে দিয়ে তোমার এই দলিল চুরি করিয়েছে। কোথায় সে ব্যাটা? এই ত—পেয়েছি ব্যাটাকে।

খুব সাধু সেজে এখন এখানে দাঁড়িয়েছ বুঝি! সস্থাভবে একরকম তেড়েই গেল চ্যাঙ্‌ফোর দিকে।

বিবর্ত মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল: থাক সস্থাভবে। ওর উপর রাগ করে কি আর হবে। যা হবার তা ত হয়েছে। ভুল ত হয়েই থাকে। সব ঘটনাই ও আমায় খুলে বলেছে। ওর ভুল ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সসেমিরা এত দেরি করে তোমায় এ খবরটা দিল কেন?

সস্থাভবে বলল: সসেমিরা সময়মতই আমাদের জানিয়েছিল। কিন্তু ইম্বল নক্ষত্রলোকের বাসিন্দারা সসেমিরার এই খবরের গতি-পথকে রুদ্ধ করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল ফের আমাদের পৃথিবী-লোকে, যাতে এই খবর কোনক্রমেই না এসে পেঁছাতে পারে আমাদের কাছে। তবু সসেমিরা নাছোড় হয়ে বুদ্ধি করে ঘুরপথে আমাদের কাছে এই খবর পাঠিয়েছে। তাই দেরি হয়ে গেছে।

সব শেষে এবার আমি মুখ খুললাম: যাক্‌ বাবা, এতক্ষণে তবু ভালয় ভালয় মিটল ব্যাপারটা। চল বিবর্ত, এবার ফেরা যাক আমাদের আশ্রয়ে। রাত অনেক হয়েছে।

ড. এক্স. এমের সঙ্গে স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময়ের পর আমরা চারজনে ফিরে এলাম আমাদের অতিথি ভবনে।

এরপর আর দুদিন মাত্র আমরা এই নক্ষত্রলোকে পূর্ব চুক্তিমত ছিলাম। বড় আরাম আয়েসে আর নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই কেটে গেল পাঁচটা দিন আমাদের এখানে। বিদায়ের দিন, এদের এই নক্ষত্রলোকের প্রাণভরা আতিথেয়তার কথা মনে করতে মনটা আমাদের সত্যিই বেদনায় ভারাতুর হয়ে উঠেছিল। ওরাও অশ্রুসজল হৃদয়ে আমাদের বিদায় জানাল।

বিদায় পুনর্বসু নক্ষত্রলোকের বন্ধু আশ্রয়দাতারা, বিদায়। পৃথিবীলোকে তোমাদেরও শুভ পদার্পণের অপেক্ষায় আমরা রইলাম। নানা নক্ষত্রলোকের সব প্রাণীর এমনি মহামিলনে ভরে উঠুক

আন্তর্মহাজাগতিক বিশ্ব। সব বিশ্বলোক এমনি করে পরস্পরের আত্মার আত্মীয় হোক।

পুনর্বসু নক্ষত্রলোকসহ মহাজাগতিক বিশ্বের আর সব নক্ষত্র-লোকের উদ্দেশ্যে বিবর্ত তার বিশেষ গাণিতিক পরিভাষার মাধ্যমে উপরোক্ত বিদায় শুভেচ্ছাবাণী ছড়িয়ে দিতেই আমাদের পাখি রকেটটা নিমেষে মহাকাশের বুকে পাড়ি জমাল। আলোর গতিতে ছুটে চলল সে আমাদের চিরপ্রিয় পৃথিবীলোকের দিকে।

নক্ষত্রলোক থেকে ফেরার বেশ কিছুদিন পরের কথা। বিবর্তসেন বসে থাকে নি নিশ্চুপ। নতুন উদ্ভাবনী কল্পনায় কাজ করেছে। একদিন গবেষণা করতে করতে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়!

সত্যিই তাজ্জব বনে গেল বিবর্ত সেন।

এমন অবাক সে অনেকদিনই হয়নি। আইনস্টাইনের সময়-স্থান-ভর-বেগ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ইতিমধ্যে কমপিউটর জগতের নয়া কমপিউটর সম্ভাবে কিংবা আন্তর্মহাজাগতিক যোগাযোগ যন্ত্র টিভিফোন আবিষ্কারের সময়ও এত অবাক সে হয়নি। বন্ধু সঞ্জয়ের কথাটা এই মুহূর্তে ফের মনে পড়ে গেল তার। সঞ্জয় বলেছিল ঃ এতে এত অবাক হবার কি আছে? তোর সব কাজই ত সৃষ্টিছাড়া।

মনে মনে হেসে উঠল বিবর্ত। তা বটে, সবই তার এমনি সৃষ্টি ছাড়া। কিন্তু…

আপাতভাবে এই মুহূর্তে এর ত কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না বিবর্ত।

দুমাস আগে লস এঞ্জেলসে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যাবার ঠিক দুদিন আগে যখন এই চিন্তাটা মাথায় আসে, তখন সঞ্জয়কে একদিন বিকেলবেলায় চা খেতে খেতে শোনাচ্ছিল তার নতুন পরিকল্পনাটার কথা।

ঃ বুঝলে সঞ্জয়, দ্বাবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশটা

নিশ্চয় থাকবে না। তাই তখনকার পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের মনন-মানসিকতার কেমন রূপান্তর ঘটবে, তা কি আমরা বর্তমান এই শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে ধরতে পারি না ?

সঞ্জয় চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল ঃ পারি—তবে তা সবই আমাদের কল্পনার আয়নায়।

ঃ না না, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গোটা ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলে ফেলেছিল বিবর্ত ঃ কল্পনার আয়নায় মোটেই নয় সঞ্জয়। একেবারে বাস্তব—চাক্ষুষই এটা করা সম্ভব।

ঃ সে ত জানি—বিবর্ত যেখানে, কল্পনা সেখানে বাস্তব হতে বাধ্য।

ঃ ঠাট্টা নয় সঞ্জয়। আমি যেটা বলছি সেটা একদমই সত্যি।

ঃ কি রকম ?

ঃ দেখ, বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি আমরা আমাদের হাজার হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর রূপ-চেহারাটাকে জানতে বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগামী পৃথিবীর এবং তার মানুষের চেহারাটা কেন প্রত্যক্ষ করতে পারব না।

ঃ তা বটে। একটি বিজ্ঞান পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে সঞ্জয় সমর্থনসূচক উক্তি করল ঃ তোমার এ যুক্তিটাকে অস্বীকার করা যায় না।

এক রকম অধৈর্য হয়ে বিবর্ত সঞ্জয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল তার গবেষণাগারে ঃ চল, তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে আজ দেখাব।

সঞ্জয় গবেষণাগারে এসে দাঁড়াতে বিবর্ত একটি সুদৃশ্য ছোট যন্ত্র হাতে তুলে নিয়ে দেখাল তাকে ঃ এই যে মজার যন্ত্রটা দেখছ—এটাই আমার নতুন পরিকল্পনা। সৃষ্টির বিবর্তনধারাকে অনুসরণ করে এই নয়া যন্ত্রের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে সৃষ্টির আদিতে কি ছিল, বর্তমানে কি আছে এবং সব থেকে মজার, ভবিষ্যতে এর কি রূপ দাঁড়াবে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল সঞ্জয় ঃ কেমন করে ?

ঃ এই যে বোতাম দেখছ নানা ধরনের, এর প্রত্যেকটা নানা গ্রুপের। তুমি যেমন চাইবে, তেমন বোতামটির উপর আঙুল একবার রাখ—ব্যস। সেই দৃশ্য ওর ভিতরের হলো (hollo) অংশের মধ্যে ভেসে উঠবে।

ঃ এ ত দেখছি তোমার টিভিফোনকেও ছাড়িয়ে গেল।

ঃ ছাড়িয়ে গেল কেন বলছ, বল পরিপূরক।

ঃ তা এটার নাম কি দিয়েছ ?

ঃ টেলিমেন্টাল থেরাপি।

ঃ বাঃ—বড় চমৎকার নামটি ত! একেবারে যথোপযুক্ত।

দেখ দেখ সঞ্জয়, বর্তমান দশকের বোতামটা টিপতে কোন দৃশ্য ভেসে উঠছে তোমার চোখের সামনে ? কি—দেখত, আকাশটা কেমন নীল—সূর্যকিরণে কেমন ঝলমল করছে পৃথিবীটা।

সঞ্জয় অবাক হয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য।

আকাশের নিচে চলমান পৃথিবীটা কত জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। ঐ যে ছোট মানুষগুলো কেমন আমাদেরই মত দৌড়োদৌড়ি করে রাস্তা পারাপার হচ্ছে। ঐ ত, ঐখানে বেশ জমায়েত দেখা যাচ্ছে। কোনকিছুর দাবিতে গণতান্ত্রিক জমায়েত বোধ হয়। ঠিক আমাদের শহীদ মিনারের মত। মাথার উপর দিয়ে প্লেনটা কেমন হুস করে উড়ে গেল। নিচে মাটির উপর দিয়ে ঠিক আমাদের যেসব যানবাহন —বাস, লরি, মোটর, ট্রেন, নৌকো, সাইকেল ইত্যাদি সব—সবই কেমন চলছে, ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, ছুটছে। ঐ ত দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে পাহাড়ি ঝর্নার জলধারা। কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য! ঠিক যেন আমাদের পৃথিবীটাকে ওখানে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্জয় এমন দৃশ্য দেখতে দেখতে আনন্দে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল বিবর্তকে ঃ সত্যি ভাই, তুই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মনীষা।

: এইত, তোর ফের বিশেষণের আধিক্য শুরু হল।

: না রে ভাই, যা সত্যি তাই বলছি। তা এমন আইডিয়া তোর মাথায় এল কেমন করে বল্ দেখি।

: সে কি, ভুলে গেলি, গত বছর যখন অনামী নক্ষত্রলোকে আমরা আন্তর্মহাজাগতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, সেখানে ওদের সম্মেলনের সর্বাধ্যক্ষ বৈজ্ঞানিক ড. এক্স. এম যে একটি মজার ছোট্ট যন্ত্র দেখিয়েছিলেন না, যার মধ্য দিয়ে নানা নক্ষত্রলোকের বাসিন্দাদের ইচ্ছেমত দেখা যায়। কি, মনে পড়েছে?

: ঠিক ঠিক!

: তা সেই যন্ত্রটা দেখেই আমার এই টেলিমেণ্টাল থেরাপি যন্ত্রটার পরিকল্পনা মাথায় আসে।

: সত্যি বিবর্ত, তোকে অভিনন্দন জানানোর ভাষা আমার নেই।

: রাখ তোর পাগলামি। এখন দেখ, আগামী দ্বাবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার পৃথিবীর রূপটা কেমন। নে, তুই না হয় পুশ কর এই বোতামটা।

বিবর্তর নির্দেশমত সঞ্জয় নির্দিষ্ট বোতামটা টিপতে এক আশ্চর্য পৃথিবীর দৃশ্য ভেসে উঠল ধীরে ধীরে যন্ত্রটির মধ্যে।

সঞ্জয় হা করে দেখতে লাগল আগামী পৃথিবীর রূপটাকে। এর সাথে যে কোন মিল নেই আজকের পৃথিবীটার!

ঐ যে গাছপালাগুলো, সেগুলোও কেমন যেন পালটে গেছে। বর্তমানের সাথে এর কোন মিল নেই। আকাশটা আজকের মতই আছে দেখা যাচ্ছে। তবে ঐ যে ছুটন্ত সব তারার মত অনেক অনেক —ওগুলো কি? আকাশে উড়ন্ত পাখির সমারোহ বড্ড কম চোখে পড়ছে।

বিবর্ত বলল: ঐ যে তারার মত ছুটন্ত সব জিনিসগুলো— ওগুলোর কোনটি হচ্ছে মানুষের তৈরি নানা জাতের মহাকাশ স্টেশন,

কোনটি হচ্ছে টেলি যোগাযোগের মাধ্যম আবার কোনটি হচ্ছে সৌরশক্তি কাজে লাগানোর মাধ্যম-উপগ্রহ।

হ্যাঁ, মানুষের চেহারাটাও কেমন যেন পাল্টে গেছে। আজকের পৃথিবীর মানুষের কল্পনায় মহাকাশ অভিযাত্রীর চেহারার আদল কেমন যেন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঐ মানুষগুলোর চেহারার মধ্যে। আর ঐ ত ওদের সব যানবাহন, যোগাযোগ সব কিছুই চলছে সৌরশক্তির উপর নির্ভর করে। যানবাহনগুলোরও চেহারা কেমন যেন সব অদ্ভুত। আজকের পৃথিবীর সাথে এর কোনই মিল নেই। বাঃ, বাঃ—আকাশপথে যানবাহনগুলো কেমন অনায়াসে চলেছে। আজকের বিমানের থেকেও কেমন সুন্দর দেখতে ওগুলো।

এমন যে টেলিমেন্টাল থেরাপি যন্ত্রটা, সেটা কিনা এমনিভাবে ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে টিভিফোনটার পাশে! আর একটি ছোট্ট ইঞ্চি দুয়েক লম্বা মনুষ্যাকৃতি জীব কেমন স্বচ্ছন্দে পাশে মুখে হাত দিয়ে বসে বসে কি ভাবছে নিবিষ্ট মনে। বোধহয় সে বিবর্তর উপস্থিতি টের পায় নি। কিংবা পেলেও উপেক্ষা করেছে তাকে।

এমন ব্যাপার—তাজ্জব না হয়ে কি পারা যায় কখনো?

এইসব সাতপাঁচ যখন ভাবছিল বিবর্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মূড় করে ঘরে ঢুকল সম্ভাভবে। বিবর্ত জানতে চাইল : কি ব্যাপার, অত ব্যস্ততা কিসের ?

: বল কি, ব্যস্ত হব না? এদিকে আর এক নতুন উৎপাত জুটিয়েছ, তাকে সামালায় কে ?

: কেন কি হল আবার ?

: তোমার টেলিমেন্টাল থেরাপির ঐ যে দেখছ আগামী দিনের মানুষটা, ও যে এখন নিজের অধিকার চাইছে পুরোপুরি। তাই ও ঐ যন্ত্রটা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

বিবর্তর খেয়াল পড়ল, গতকাল সঞ্জয়কে যখন সমস্ত দেখাচ্ছিল, সেই সময় গল্প করতে করতে আগামী পৃথিবীর রূপ চেহারার পরিবেশ সৃষ্টির বিশেষ বোতামটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। বোতামটা খোলা রেখেই শেষ পর্যন্ত গল্প করতে করতে গবেষণাগার থেকে সঞ্জয়ের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। আর তার ফলেই এই বিপত্তি।

সস্থাভাবে বলল : তুমি তখন ঘুমোচ্ছ। বেশ রাত্রি তখন। হঠাৎ তোমার গবেষণাগার থেকে বিশেষ এক ধরনের সঙ্কেত বার্তা কানে এল আমার। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখি তোমার টিভিফোনের সাদা পর্দায় আমাদের সেই অনামী নক্ষত্রলোকের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ড. এক্স. এমের ছবি ও তার কথার সঙ্কেত ভেসে উঠেছে।

বিবর্ত প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল : সে কি এটা কি করে সম্ভব হল ? আমি ত কোন যোগাযোগ করি নি তাদের সঙ্গে।

: কেন ঐ আগামী দিনের মানুষটাই ত দেখলাম তোমার থেরাপি যন্ত্রের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে টিভিফোনের যোগাযোগের বিশেষ বোতামটা টিপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সাদা পর্দার ছবির দিকে তাকিয়ে।

: তারপর ?

: তারপর দেখি কি, কি সব দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় ড. এক্স. এমের সঙ্গে ও কথা বলে চলেছে অনর্গলভাবে।

: সত্যি, বড় আশ্চর্য ব্যাপার ত !

: আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। আমার মনে হয় কি জান, ও বোধ-হয় ওর এই আগাম আবির্ভাবের জন্য তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

: কি করে তুই বুঝলি ?

: ড. এক্স. এমের সঙ্গে কথা বলার সময় এটাই ও বারবার করে তাঁকে বলছিল বলে মনে হল।

ঃ তারপর কি হল ?

ঃ মানুষটা দেখি যতই নাছোড় হয়ে উঠছে—এক্স. এমের কথা কিছুতেই শুনছে না, ঠিক তখনই দেখি যোগাযোগটা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। আর তখন থেকেই দেখছি, ঠিক ঐভাবে মানুষটা মুখে হাত দিয়ে বসে আছে।

ঃ হ্যাঁ রে ওর পাশে ঐ পাত্রটা কি ?

ঃ একে খেতে দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখছি, ও কিছুই খায় নি।

ঃ ওর বোধহয় আমাদের খানা পছন্দ নয়।

ঃ না, না, ওদের যুগের উপযোগী খানাই ত মোটামুটি দিয়েছিলাম—এটা কি আমার বুদ্ধিতে ধরা পড়বে না বলে তুমি মনে কর ?

মৃদু হেসে বিবর্ত সম্ভাভবের পিঠে আদরের ভঙ্গীতে একটি ছোট্ট চড় মেরে বলল ঃ সে আমি জানি রে।

এর পরের ঘটনাটা আরও বেশি চমকপ্রদ।

বিবর্ত সেন বেশ বেচালেই পড়েছে বলে মনে হল বাইরে বেরিয়ে আসা আগামী দিনের মানুষটাকে নিয়ে। ইতিহাসেই ত দেখতে পাওয়া যায় পূর্বপুরুষ আর উত্তরপুরুষের মধ্যে চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণা, মানসিকতার কত আশমান-জমিন ফারাক। সংসারেও ত কত গরমিল হরবকত আমাদের চোখে পড়ছে। ঠাকুরদা-নাতির মানসিকতার মধ্যে সমুদ্রযোজন তফাৎকে ত আমরা প্রাকৃতিক সত্য বলে অনেক সময় মেনে নি। বিবর্ত এটা জানে। তাই সে চটপট আগামী দিনের মানুষটার চিন্তার আরও গভীরে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল কেন সে ওরকম আচরণ করল। অর্থাৎ তার স্বাধীনতার জন্যে অনামী নক্ষলোকের ড. এক্স. এমের কেন শরণাপন্ন হল ? ঐ নক্ষলোকের সঙ্গে এর কি কোন নাড়ির যোগ আছে ?

এইসব সাঁতপাঁচ ভাবছিল আর থেরাপিযন্ত্রটাকে ঠিকঠাক করছিল

বিবর্ত যাতে ফের ওকে ঐ যন্ত্রের মধ্যে ভরে তার স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে এনে এজ গ্রুপ এই সমস্যাটার সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

ঠিক কথা। এতক্ষণে বিবর্তর মাথায় এল মানুষটা কেন ঐ রকম আচরণে উদ্বুদ্ধ হল? অনামী নক্ষত্রলোকের এক্স. এমের যন্ত্রটার চিন্তা মাথায় রেখে এই থেরাপি যন্ত্রটা বিবর্ত বানিয়েছে। তাতে এই যন্ত্রটার সঙ্গে অনামী নক্ষত্রলোকের নাড়ির টান রয়ে গেছে যে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আন্তর্মহাজাগতিক বাসিন্দাদের মধ্যে যে সহজ যোগাযোগ গড়ে উঠবে বলে বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, সেই ভাবনার দিক থেকেও দেখতে গেলে বর্তমান পৃথিবীর এই পরিবেশে আগামী দিনের এই মানুষটার একাকীত্ব বা ইনসিকিওরড ফিল করা মোটেই বিচিত্র নয়। এই কারণেই বোধহয় ও এক্স. এমের সাহায্য নিয়ে ওর নিজের পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

বিবর্তর এইসব চিন্তা ও কাজের মধ্যে ছেদ পড়ল টিভিফোনটা বিচিত্রভাবে বেজে উঠতে। চটপট উঠে গিয়ে বিবর্ত দাঁড়াল টিভি-ফোনের পর্দার সামনে নির্দিষ্ট বোতামে হাত রেখে। পাশে তাকিয়ে দেখল, সস্থাভবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসছে।

বিবর্ত আশ্চর্য হয়ে দেখল ড. এক্স. এমের মুখ পর্দায় ভেসে উঠেছে এবং সঙ্গে বিচিত্র সাংকেতিক ধ্বনি।

সস্থাভবে বলল : ভালই হল, আমার আবেদনে এক্স. এম সাড়া দিয়েছেন তাহলে।

: সে কি রে? তুই কি ওঁর সাথে এর মধ্যে যোগাযোগ করেছিলি?

: তাহলে আর বলছি কি।

: কেন?

: বা রে, থেরাপির এই মানুষটা যে কোন উল্টো বিপত্তি বাঁধিয়ে বসবে না, তার কি কিছু ঠিক আছে?

: তা এক্স. এম এর বিহিত কি করবে রে পাগল?

: কেন, ওরা ত আমাদের পৃথিবীলোকের থেকে বেশ কয়েক

শতাব্দী এগিয়ে আছে। তাই ওরা নিশ্চয়ই জানে এমন অবস্থায় কি করণীয়। তাছাড়া ওদের ওখানে যে যন্ত্রটা থেকে তোমার এই যন্ত্রের আইডিয়াটা মাথায় এসেছে, সেই যন্ত্রের ব্যাপারটা হাতে-কলমে পরীক্ষার সময় যে মজার ঘটনাটা ঘটেছিল, তাও ত খানিকটা এই রকমই ব্যাপার ছিল।

ঃ তুই ঠিকই ধরেছিস সম্ভাভবে। যাক, এবার তুই একটু চা আন দেখি। ততক্ষণে এক্স. এমের সঙ্গে পরামর্শটা সেরে নি।

বিবর্ত যেমনটি ভেবেছিল, ড. এক্স. এম তেমনটিই বললেন বিবর্তকে করতে। বিবর্তর উর্ধ্বমুখী মনীষা আর একবার প্রশংসিত হল এইভাবে।

যাক গে, এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

থেরাপি যন্ত্রটা ঠিক করে আগামী দিনের মানুষটাকে তার মধ্যে ভরতে বিবর্তর তারপর বেশি সময় ব্যয় করতে হয় নি। থেরাপি যন্ত্রটার মূলাধারে যে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরির সাঁড়াশি যন্ত্রটা রয়েছে, সেটাকে বিশেষ কায়দায় চালু করে মানুষটার চোখ ও মাথা বরাবর নিশানা করে ধীরে ধীরে অ্যানেসথেটিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে এক সময় টুপ করে তাকে যন্ত্রের মধ্যে ভরে ফেলা হল। অবশ্য সম্ভাভবের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য এই জটিল কাজটা খুব সহজেই সম্পন্ন করতে পারল বিবর্ত। সত্যি, ফিজিও থেরাপির ঐ জ্বলন্ত তারটা যদি কোনরকমে মানুষটার গায় লাগত, তাহলে কি যে সর্বনাশ ঘটে যেত সেটা ভাবতে এখনও বিবর্তর গা শিরশির করে উঠছে।

ঃ যাক, এ যাত্রা তাহলে বেশ ভালভাবেই রক্ষা পাওয়া গেল—কি বল্? থেরাপি যন্ত্রটাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে বন্ধ করতে করতে বিবর্ত সেন সম্ভাভবেকে বলল।

অন্যমনস্কের সুরে সম্ভাভবে বলল ঃ তা ত বটেই। যাক গে,

অনেক ধকল আজ গেল সারাদিনে। নাও ওঠ। নিজের অন্য কাজকর্মগুলো এবার সার। আবার ত বিকেলেই কনফারেন্সে দৌড়তে হবে।

ঃ সত্যি রে, একেবারেই যে সে কথা ভুলে গেছিলাম। নে, তুই ঘর বন্ধ করে একবার সঞ্জয়কে খবর দে। আমি ততক্ষণে হাতের অন্য কাজগুলো সেরে নি। বিবর্ত সেন এক রকম দৌড়েই আপন গবেষণাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হল ॥

শেষ